মিশ্ররাগ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
4656
LIBRARY.
3.4.58
Agartala.

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—সাড়ে তিন টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন : শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও নিউ সরস্বতী প্রেস ১৭, ভীম ঘোষ লেন হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের—

চেনামহল
দূরভাষিণী
শ্রেষ্ঠগল্প
কন্যাকুমারী
চড়াই-উৎরাই
হলদে-বাড়ি
দ্বীপপুঞ্জ
ওপাশের দরজা
মলাটের রঙ
অক্ষরে অক্ষরে
সঙ্গিনী
গোধূলি
কাঠগোলাপ
ধূপকাঠি
অনুরাগিণী
শুক্লপক্ষ
বসন্তপঞ্চম
নিরিবিলি

স্বপ্নকমল

লেবার ওয়ার্ডে আর জায়গা ছিল না। বড় হলঘর তো ভরেই গেছে, দু'পাশের বারান্দার এক্সট্রা বেডগুলি আসন্নপ্রসবা আর প্রসূতির দলে বোঝাই। তবু বছর দুই আগের পাশ-করা ছোকরা ডাক্তার সুনীল চক্রবর্তী ব্যস্তভাবে বেলা প্রায় এগারোটার সময় এসে বলল, 'আপনার ওয়ার্ডে আর একটা বেডের ব্যবস্থা করতে হবে মিস গোস্বামী।'

স্টাফ নার্স সুলেখা বিরক্ত হয়ে বলল, 'করতে তো হবে, কিন্তু কোথায় এনে ঢোকাবেন এখানে ? জায়গা কই আর ?'

ডাঃ চক্রবর্তী আর একটু এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'জায়গা কোনরকমে করতেই হবে। ডাঃ মুখার্জির পেশেণ্ট।'

সুলেখা আর কোন কথা বলল না। ডাঃ মুখার্জি এই ওয়ার্ডের সিনিয়র হাউস সার্জন।

সুনীল চক্রবর্তী সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, একটা বেলা কিছু অসুবিধে হবে ! তেরো নম্বর আর সাতাশ নম্বর ওবেলা ডিসচার্জ করে দিচ্ছি, নয়ত কাল সকালে।

সুনীল কথাটা শেষ করতে না করতেই পেশেণ্ট এসে হাজির হল।

বাইশ তেইশ বছরের একটি তরুণী সুন্দরী বউ। আর একটি মহিলা তার হাত ধরে নিয়ে আসছেন। এই অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে, হাঁপাচ্ছে।

সতেরো আঠেরো বছরের আর একটি শিক্ষানবিশ নার্স কি করবে, নতুন পেশেন্টকে কোথায় বসতে দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। সুলেখা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ মল্লিকা! একটা টুল-টুল এনে বসতে দাও ওঁকে।'

বলতে বলতে সুলেখা নিজেই একটা টুল এনে দিয়ে বলল, 'আপনি বসুন এখানে।'

বউটি লজ্জিতভাবে তার ওপর বসল। সঙ্গের মহিলাটি বললেন, 'খুব নরম হয়ে পড়েছে; এই প্রথম। আমি ওর দিদি। আপনি বুঝি এখানকার স্টাফ নার্স?'

সুলেখা বলল, 'হ্যাঁ।'

মহিলাটি বললেন, 'একটু বিশেষ কেয়ার নিয়ে—এই প্রথম কিনা—'

সুলেখা বলল, 'প্রথম হোক আর দ্বিতীয় হোক, কেয়ার ঠিকই নেওয়া হবে। আমরা তো সেই জন্যেই আছি।'

তারপর ওয়ার্ডের জমাদারদের ডেকে হুকুম দিল, 'এই হরি, এই রাধানাথ একখানা খাট নিয়ে এস তো। বারো নম্বর আর তেরো নম্বরের মাঝখানে এখনকার মত পেতে দাও। এইভাবে কি মানুষে কাজ করতে পারে? বেড নেই, তবু পেশেন্ট নিতে হবে! কই বেটাছেলে কে এসেছেন সঙ্গে?'

ঊনত্রিশ-ত্রিশ বছরের মোটাসোটা একটু বেঁটে ফর্সামত এক যুবক এই প্রমীলা-রাজ্যে ঢুকে বোধ হয় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। সুলেখা তার মুখের দিকে ভাল করে না তাকিয়েই ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনারই বা কি

আক্কেল শুনি? ওয়েটিং রুমে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারলেন না? একেবারে হুড়মুড় করে এসে হাজির?'

যুবকটি অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমাদের যে বলে দিল সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনারা যান—'

সুলেখা মুখে একটু বিকৃত ভঙ্গি এনে বলল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে! এখানকার মত এমন অব্যবস্থা আর কোথাও নেই—।' আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সুলেখা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ততক্ষণে অখিলেশও চিনতে পেরেছে। চেনা অবশ্য শক্তই। এই কালো স্থূলাঙ্গী, মাথায় সাদা শিরোভূষণ আঁটা, বদমেজাজী রূঢ়ভাষিণী একটি বিগত যৌবনকে দেখে দশ বছর আগের সেই তন্বী শ্যামা সুলেখাকে মনেও আনা যায় না।

অখিলেশ বলল, 'তুমি!'

সুলেখা অস্ফুট প্রতিধ্বনি কবল, 'তুমি!'

মহিলাটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।

এবার বললেন, 'তোমাদের পরিচয় আছে বুঝি অখিল?'

চমকে উঠল অখিলেশ। পিছন ফিরে বলল, 'হ্যাঁ। আসুন এবারে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

'ইনি আমার ইয়ে—মানে আমার স্ত্রীর দিদি আর এ হল সুলেখা। এক সময় আমাদের মধ্যে—'

অখিলেশের স্ত্রীর দিদি মৃদুলার বয়স বছব পঁয়ত্রিশ। সিঁথিতে সিন্দুর, সুন্দরী পুষ্টাঙ্গী মহিলা। চওড়া পেড়ে মিহি শাড়ি, আর হাতের মোটা বালা, আঙ্গুলের নীল পাথর বসানো আংটিতে সচ্ছল ঘরের গৃহিণী বলে সহজেই চেনা যায়।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় ছিল! সে কথাটা বলতে এত গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছ কেন? আমার এই ছোট ভগ্নীপতিটি ভারি নার্ভাস।'

সুলেখার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন তিনি। তারপর নিজের বোনের দিকে ফিরে বললেন, 'রীণার পরিচয় বোধ হয় আর আলাদা করে দিতে হবে না। এখন আর ভাবনা কি রীণা, নতুন এক দিদি পেয়ে গেলি এখানে।'

শরীর খুবই খারাপ লাগছিল। তলপেটে একটা চিন্‌চিনে ব্যথা লেগেই আছে। তবু রীণা সব ভুলে নার্সটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

কিসের যেন একটা রহস্যের আভাস পেয়েছে। তার দুটি আয়ত সুন্দর চোখে কি শুধু কৌতূহল না আরো কিছু?

সুলেখার দিকে চেয়ে সে এবার হাত তুলে ছোট একটু নমস্কার জানাল।

সৌজন্যের নিয়ম রাখল সুলেখাও।

তারপর আর একবার তাকাল রীণার দিকে। এবার আর পেশেন্টকে দেখছে না, তরুণী রূপবতী নারীর দেহ-সৌষ্ঠবের পরীক্ষার ভিতর দিয়ে, অখিলেশ জীবনে কতখানি সুখী হয়েছে তাই যেন যাচাই করতে চাইছে।

রীণা মৃদুলার দিকে চেয়ে বলল, 'দিদি, কতক্ষণ এভাবে বসে থাকব?'

সুলেখার যেন চমক ভাঙল। লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও আপনার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে? একটু বসুন, এক্ষুনি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

হঠাৎ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল সুলেখা। অধস্তন আরো দুটি নার্সকে ধমক লাগাল, জমাদার দরোয়ানদের ফরমায়েশ করল, লম্বা হলঘরের এধার থেকে ওধারে ঘুরে এল একবার।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেড ঠিক হয়ে গেল। নিজের হাতে সযত্নে পরিষ্কার চাদর পেতে দিল সুলেখা। বালিশটা ঠিক করে দিল। দরকার ছিল না, তবু নিজেই রীণার হাত ধরে এনে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এবার শুয়ে পড়ুন।'

লম্বা খাতায় রীণার নাম ঠিকানা লিখে নিল সুলেখা। তারপর অখিলেশের দিকে চেয়ে বলল, 'খাবার-টাবার কি বাড়ি থেকে আসবে, না আমরা এখান থেকেই ব্যবস্থা করব?'

অখিলেশ বলল, 'না ভাত বাড়ি থেকেই দিয়ে যাবে। বাসা আমাদের কাছেই, এই শ্যামবাজার।'

সুলেখা বলল, 'তা জানি। ঠিকানা এ্যাডমিশন কার্ডের মধ্যেই পেয়েছি।'

যাওয়ার আগে মৃদুলা আর একবার বললেন, 'দেখবেন কিন্তু।'

সুলেখা হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই, এইতো আমাদের কাজ।'

বিদায় নেওয়ার আগে অখিলেশ একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ভিজিটিং আওয়ারস যেন কখন?'

সুলেখা বলল, 'পাঁচটা থেকে সাতটা।'

তারপর অখিলেশকে দাম্পত্যালাপের সুযোগ দিয়ে সে হলের আর একদিকে অন্য বেডের কাছে চলে গেল।

পাঁচটার একটু আগেই অখিলেশকে ফের হলের সামনে দেখা গেল। মৃদুলা এবেলা আর আসতে পারেন নি।

সুলেখা অন্য রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিল। একটু অপেক্ষা করতে হল অখিলেশকে। সুলেখা কাছে এসে দাঁড়াতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'বেড খালি দেখছি যে? ও কোথায়?'

সুলেখা একটু হাসল, 'এই একটু আগে লেবার রুমে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অখিলেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'সে কি! এত তাড়াতাড়ি?'

সুলেখা এবারও হাসল, 'যত তাড়াতাড়ি হয় ততই তো ভাল। ততই তো কষ্ট কম। ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিকই আছে।'

অখিলেশ বলল, 'আমি তাহলে বাইরে অপেক্ষা করব?'

সুলেখা বলল, 'হ্যাঁ, ভিতরে আর কোথায় অপেক্ষা করবে? বাইরে ওয়েটিং রুমে বস গিয়ে। আমি ঠিক সময়মত খবর পাঠিয়ে দেব।'

যেতে যেতে কি ভেবে আবার ফিরে এল অখিলেশ।

সুলেখা অন্য বেডে চলে যাচ্ছিল, মল্লিকা ডেকে আনল তাকে।

সুলেখা এবার একটু বিরক্ত হয়েছে। বলল, 'কি ব্যাপার!'

অখিলেশ ইতস্ততঃ করে লজ্জিতভাবে বলল, 'ইয়ে...'

'তুমি থাকবে তো সেখানে?'

'না, আমার ডিউটিতো এই ওয়ার্ডে। তাছাড়া আমার থাকবার দরকারই বা কি। সেখানে ভালো ডাক্তার থাকবেন, নার্সরা থাকবে, ভয়ের কিছু নেই।'

অখিলেশ বলল, 'তবু তুমি থাকলে আরো বেশি ভরসা পাব।'

সুলেখার একবার ইচ্ছা হল বলে, 'এত বিশ্বাস আমার ওপর? এত দরদ?'

কিন্তু বলল না।

'আচ্ছা যদি চাও, আমিও না হয় থাকব। কোন চিন্তা কোরো না তুমি, বোসো গিয়ে বাইরে।'

তবু একমুখ উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে অখিলেশ যে বিদায় নিল, সে কথা বুঝতে সুলেখার একটুও দেরি হল না। জানলা দিয়ে দেখতে পেল অখিলেশ করিডোরে দাঁড়িয়ে কি যেন আলাপ করছে।

হঠাৎ এক অদ্ভুত দুঃসহ বিদ্বেষে সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল সুলেখার। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে নিয়েই অখিলেশের যত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা, দরদ আর সহানুভূতি, কিন্তু দশ বছর আগের কথা অখিলেশ একেবারেই ভুলে গেছে। পুরুষ এই রকমই হয়। নির্লজ্জ, নির্মম, সুবিধাবাদী। এতকাল বাদে দেখা। কিন্তু সুলেখা কেমন আছে, সে কথা একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করবার ইচ্ছা হয়নি অখিলেশের। যেন আরো পাঁচজন নার্সের মত সুলেখাও একটি নার্স মাত্র। অখিলেশের সঙ্গে যেন তার আর কোন সম্বন্ধ নেই, সম্বন্ধ ছিল না।

ন'টার সময় খবর পাওয়া গেল, ছেলে হয়েছে অখিলেশের। শুধু শোনা নয়, নিজের চোখে দেখে এলো সুলেখা। রীণার জ্ঞান এখনো ফেরেনি। বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। নিজে ধরতে গিয়েও ধরল না সুলেখা। এক পলক তাকিয়ে একটু দেখল, তারপর নার্স আর দাইকে দরকারী উপদেশ নির্দেশ দিয়ে অন্য কেস এ্যাটেন্ড করতে চলে যাওয়ার আগে দরোয়ানকে ডেকে বলল, 'ওয়েটিং রুমে অখিলেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁকে গিয়ে বল ছেলে হয়েছে। সব ভাল আছে।

ভাবনা নেই। কাল সকালে এলে সব দেখতে পাবেন। এখন দেখবার নিয়ম নেই আমাদের।'

দরোয়ান ঘুরে এসে বলল, 'তিনি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চান!'

সুলেখা বলল, 'বলে দাও আমি খুব ব্যস্ত। আজ আর দেখা হবে না। যা বলবার তিনি যেন কাল সকালে এসে বলেন।'

ওয়ার্ডের কাজ-কর্ম সারতে সারতে রাত দশটা হল। কেন যেন বার বার বড়ই আজ উন্মনা হয়ে উঠছে সুলেখা। কাজে কেবলই ভুল হচ্ছে।

সহকারিণী মিনতি তা লক্ষ্য করে বলল, 'সুলেখাদি তোমার আজ হয়েছে কি বল তো? শরীর-টরির খারাপ করেছে নাকি?'

সুলেখা প্রতিবাদ করে বলল, 'বালাই, আমার শরীর খারাপ হতে কোন দিন দেখেছ?'

তবু নাইট শিফ্‌টের ইনচার্জকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আজ একটু তাড়াতাড়িই বিদায় নিল সুলেখা। হাসপাতালের গেট পার হয়ে বাস স্টপের কাছে আসতেই দেখে অখিলেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুলেখা বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি, তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছ? বউ ছেলেকে পাহারা দিচ্ছ নাকি?'

অখিলেশ বলল, 'না, সেজন্যে তো তোমরাই আছ।'

সুলেখা বলল, 'ওরা ভালই আছে। কাল ভোরে এসে ছেলের মুখ দেখো।'

অখিলেশ বলল, 'আমি সে কথার জন্যে এখানে দাঁড়াইনি সুলেখা।'

সুলেখা বলল, 'তবে ?'

অখিলেশ বলল, 'তোমার সঙ্গে আরো কথা আছে।'

সুলেখা বলল, 'কিন্তু আমার তো মনে হয় আর কোন কথাই আমাদের বাকি নেই।'

বাস এসে দাঁড়াল। অখিলেশ সুলেখার পিছনে পিছনে উঠে পড়ল বাসে। বলল, 'চল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। কোথায় থাক ?'

সুলেখা বলল, 'এই কাছেই, জীবনকৃষ্ণ মিত্র লেনে। কিন্তু তুমি ত থাক একেবারে উল্টোদিকে। তোমার ফিরতে অসুবিধে হবে। তুমি ববং এখনই নেমে যাও।'

কিন্তু অখিলেশ নেমে গেল না। সুলেখার পাশে এসে বসল, তাবপব আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ভেবেছ ছেলে হওয়ার খবর শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি তাই না!'

সুলেখা পরিহাসেব সুরে বলল, 'তাই তো স্বাভাবিক, মেয়েব চেয়ে ছেলে হওয়াব খবরেই লোকে বেশি খুশী হয়।'

অখিলেশ বলল, 'তোমাকে আমার মনে কথা বোঝাতে পারব না সুলেখা।'

'দশ বছর আগে অনেক বুঝিয়েছ, এখন থাক।'

মোড়ে এসে বাস থামতে সুলেখা বলল, 'আমাকে এখানে নামতে হবে।'

অখিলেশ বলল, 'চল আমিও নামি। বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি তোমাকে।'

সুলেখা প্রবল আপত্তি জানাল, 'মাপ করো। তোমাকে আজ আর আমি বাসা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব না।'

অখিলেশ আহত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এতকাল বাদে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি চাইনে। কিন্তু দোষ শুধু আমার একারই ছিল না সুলেখা।'

সুলেখা বলল, 'সে কথা তুলে আর লাভ কি।'

অখিলেশ বলল; 'আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব। বিয়ে কর নি কেন সুলেখা?'

সুলেখা একটু হাসল, 'একথা তুমি কেন আরো অনেকেই জিজ্ঞেস করে। কাউকে বলি বর জোটে নি, কাউকে বলি প্রবৃত্তি হয় নি। আমি এবার নামি, একটা স্টপেজ বেশি চলে এসেছি।'

অখিলেশকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সুলেখা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। একা একা অনেকখানি পথ হেঁটে আসতে হল তাকে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে বিবর্ণ একফালি চাঁদ। পথ প্রায় জনশূন্য। গলির দুই ধারে ঘুমন্ত বাড়ি। নিজেদের একতলা বাড়িটার জানলায় তখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

দরজার কড়া নাড়তে হল না। পায়ের শব্দ শুনেই ছোট বোন চিত্রা এসে দোর খুলে দিল। বলল, 'দিদি আজকে রাত হল এত?'

সুলেখা বলল, 'কই রে, আজ বরং সকালেই এসেছি।'

পাশের ঘরে থাকেন প্রৌঢ়া বিধবা মা আর ছোট দুই ভাই—হীরু আর নিরু। হীরু বছর দুই হল বি-এ পাশ করে চাকরিতে

ঢুকেছে। নিরু এখনো কলেজে পড়ে। মেজো বোন সুমিত্রার বিয়ে হয়ে গেছে তিন বছর আগে। এ ঘরে থাকে শুধু চিত্রা আর সুলেখা। সুলেখা আসবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে জড়ো হল। ভাই-বোন কেউ এখনো খায় নি। এক সঙ্গে বসে খাবে। প্রত্যেকেই সুলেখার খুব অনুগত। দিদিকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

তাদের দিকে চেয়ে সুলেখা বলল, 'তোরা আজ খেয়ে নিলেই পারতিস। কত রাত হয়ে গেছে।'

হীরেন প্রতিবাদ করে বলল, 'কি যে বল দিদি, এগারোটাওতো বাজে নি।'

সুলেখা বলল, 'না বাজুক। তোরা খেয়ে নে। আমি খাব না, শরীরটা ভালো লাগছে না তেমন।'

সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা এসে মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করলেন, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'না গা ভালই আছে। জ্বর-জ্বারি কিছু হয় নি। রাত্রে উপোস দেওয়া ভাল নয়। অল্প কিছু খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। শরীরের আর অপরাধ কি, সেই যে জোয়াল কাঁধে নিয়েছিস, তারপর আর দুটো দিন বিশ্রাম নিলি নে।'

না খেলে আবো গোলমাল বাড়বে। তাই তাড়াতাড়ি বাথ-রুমে ঢুকে স্নান সেরে ভাই-বোনদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন শেষ করে নিল সুলেখা। অন্যদিন খাওয়ার পরেও তাদের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে সুলেখা। রাজনীতি, সমাজনীতি, সিনেমা, সাহিত্য কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। কিন্তু আজ মায়ের তাগিদে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হল। নিজের তাগিদও ছিল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সারা বাড়ি নিঝুম হয়ে গেল। কিন্তু অন্য দিনের মত সুলেখার আজ আর ঘুম এল না। অন্ধকারে চোখের সামনে টুকরো টুকরো ছবি ভেসে বেড়াতে লাগল। অখিলেশের সঙ্গে, তার স্ত্রী আর শ্যালিকার সঙ্গে কি খুব রূঢ় ব্যবহার করেছে সুলেখা? আর একটু ভদ্র ব্যবহার কি সঙ্গত ছিল না? তাছাড়া এতদিন বাদে অখিলেশের সামনে মনের ঝাঁজ প্রকাশ করে কি লাভ হল? নিজের নৈরাশ্য, ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতাই শুধু বেরিয়ে পড়ল সুলেখার। আর কিছু হল না। এর চেয়ে নির্লিপ্ত থাকতে পারলেই বরং ভাল ছিল। বোঝাতে পারলে ভাল ছিল—অখিলেশের মত সুলেখাও সব ভুলে গেছে।

সুলেখাও তার চাকরি নিয়ে ভাইবোনদের পরিবার নিয়ে সমান সুখী হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

কিন্তু এ কথা বলা কি সহজ? সে কথা ভোলা কি সোজা?

আজ নয়, বারো বছর আগে অখিলেশ চন্দ প্রথম এসেছিল তাদের পরিবারে। সুলেখার বাবা সুধানাথ গোস্বামী তখন বেঁচে। কলেজে বাংলা আর সংস্কৃত পড়ান। মানিকতলার দোতলার একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে বাপমায়ের স্নেহে আদরে দিনগুলি ভালই কেটে যাচ্ছিল সুলেখার। একটু অভিযোগ শুধু ছিল। বাবা বড় গোঁড়া। নিজের ধ্যানধারণাকেই সবচেয়ে ভালো বলে মনে করেন। বিলাসিতা আড়ম্বর ভালবাসেন না। নিজের আদর্শের সঙ্গে যাদের মেলে না তাদের কাছ থেকে দূরে থাকেন।

এই কঠিন যাচাই-বাছাইয়ের ফলে সুলেখার মামা, মেসো আর মামাতো-মাসতুতো ভাইবোনেরা পর্যন্ত বাদ যেত। তাই নিয়ে মার

সঙ্গে বাবার ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকত। সুলেখার মা বলতেন, 'দুনিয়ার সবাই খারাপ, তুমিই শুধু ভালমানুষের গোড়া।'

বাবা বলতেন, 'আমি তা বলি নে। আমি বলি আমার মতের সঙ্গে, পথের সঙ্গে যাদের মেলে আমি শুধু তাদের নিয়েই চলব।'

সেই মিল সবচেয়ে বেশি নেত্রকোণার পোস্টমাস্টার নিশাকান্ত চন্দের সঙ্গে। দু জনে বছর দুই একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। সেই থেকে ভাব। নিশাকান্ত তাঁর ছেলে অখিলেশকে নিয়ে এলেন সুধানাথের কাছে। ইংরেজীতে এম-এ পড়বে অখিল। কলকাতার কোন্ হোস্টেল মেসে খরচ কম পড়বে সেই পরামর্শ করতে এসেছেন। সুধানাথ বলেন, 'আমার বাসা থাকতে তুমি যদি ছেলেকে হোস্টেলে পাঠাও তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

শেষ পর্যন্ত সুলেখাদের বাসাতেই রয়ে গেল অখিলেশ। দুদিনেই সুলেখার বাবা বন্ধুপুত্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এমন ছেলে আজকালকার দিনে মেলে না। কোন চাল নেই, বিলাস-ব্যসন নেই, বাজে ঠাট্টা ইয়ার্কি নেই, পান সিগারেট ভুলেও খায় না। যে সব অভ্যাস আর আচার আচরণকে সুধানাথ আদর্শ বলে জানেন, অখিলেশ প্রায় তার সবগুলি মেনে চলে। ধীরে ধীরে অখিল সুধানাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে উঠল। নিজের পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে সে অনেক কাজ করে সুলেখার বাবার। তাঁর নোটের প্রুফ দেখে দেয়, জরুরী চিঠিপত্র লেখে, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর খোঁজ-খবর নেয়। সবাই অখিলের ভক্ত হয়ে উঠল। বাবার মুখে সুখ্যাতি, মায়ের মুখে প্রশংসা। অখিলের মত ছেলে আর হয় না। সুলেখাও আকৃষ্ট হল। ভাল ছেলের ওপর ভাল

মেয়ের আকর্ষণ স্বাভাবিক। সুলেখা অখিলের চা করে দেয়, জামার বোতাম লাগায়, ময়লা রুমাল আর গেঞ্জি কাচে। অখিল সুলেখাকে আই-এর কোর্স পড়ায়। সহজ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দুজনের। কেউ কিছু মনে করে না। কিন্তু নিজেদের মন বুঝতে বেশি দেরি হল না সুলেখার। ছুটি-ছাটায় অখিল গাঁয়ে চলে গেলে সুলেখার দিন কাটতে চায় না। চিঠিতে অখিলও সেই কথা জানায়। সুলেখা ভালো মেয়ে, অখিলও ভাল ছেলে—তবু দু জনের সম্পর্কের ধারা ঠিক সোজা পথে চলল না। এঁকে বেঁকে লুকোচুরির পথ ধরলো। বাপ, মা, ভাইবোনদের চোখেব আড়ালে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল। সুলেখা যেন দুটি সত্তায় ভাগ হয়ে গেছে—সংসাবের আব পাঁচ জনেব কাছে সে এক রকম, অখিলের কাছে আর এক রকম। তার যতখানি প্রকাশ তার চেয়েও বেশি গুপ্ত। অখিলেবও তাই। সুলেখা টের পেল তাকে যত ভালমানুষ দেখায়, ভিতরে ভিতবে সে তত ভালমানুষ নয়। তা নাই বা হল। আলাদা আলাদাভাবে ভাল হয়ে বাস করার চেয়ে দু জনের মধ্যে ভালোবাসা হওয়া ঢেব ভাল। প্রথম প্রথম সেই ভালবাসা সীমাবদ্ধ হয়ে বইল শুধু টুকরো চিঠি আর ছোটখাট উপহার দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে, তারপর তা সীমা ছাড়াতে লাগল নিত্য নূতন সংকেত বার করবার চেষ্টায়। দেখা গেল সুলেখার বুদ্ধি অনেক বেশি, আর তাব পরামর্শ নিয়ে চলতে অখিলেশের মোটেই আপত্তি নেই।

বিষ্ণুপদ বাঁড়ুয্যে সুধানাথের সহকর্মী বন্ধু। তার ভাইপোর অন্নপ্রাশনে সুলেখাদেব সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলেন সন্ধ্যাবেলায়।

কিন্তু সুলেখা গেল না। মাথা ধরার অজুহাতে বিছানায় পড়ে রইল। আর অখিলেশও সেদিন লাইব্রেরী থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল। শুধু চেয়ে দেখা নয়, হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি নয়, সেই নির্জন নিভৃত সন্ধ্যায় তাঁরা দু জনে পরস্পরের উপর এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করল। মনে হল তাদের যখন এক রুচি, এক মন, এক প্রাণ, তখন দুটি আলাদা-আলাদা দেহ কেন। তারা অনুভব করল এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সর্বক্ষণ মেনে চলবার কোন সার্থকতা নেই। কিংবা অত-শত কথা তখন কিছুই ভাবে নি সুলেখা। অখিলেশ ওই ধরণের তত্ত্বই কিছুই একটা বলেছিল বটে, কিন্তু না বললেও কিছু এসে যেত না। না বললেও যা ঘটেছিল তাই ঘটত।

লুকোচুরি বেশিদিন চলল না। প্রথম দু মাস মার কাছে মিথ্যা কথা বলল সুলেখা। কিন্তু তৃতীয় মাসে আর পারল না। ধরা পড়ে গেল, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বিশ্বাসঘাতকতা করল।

সুলেখার মা বললেন, 'পোড়ারমুখী এমন করে কুলে কালি দিলি! সে কে স্পষ্ট করে বল।'

অখিলের নাম সুলেখার মুখ থেকে তাঁরা বের করে নিলেন। না বলেই বা উপায় কি ছিল তখন।

সুধানাথ গভীর রাত্রে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন অখিলের হাত। বললেন, 'সব দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম, তার এই শোধ নিলে!'

অখিল বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।'

সুধানাথ গর্জে উঠলেন, 'শূদ্র হয়ে এত স্পর্ধা তোমার! আমি

তোমার জিব এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলতাম কিন্তু তুমি নেহাৎই নিশা-কান্তের ছেলে।'

অখিল বলল, 'কিন্তু যা ঘটেছে তারপর আমি ওকে বিয়ে না করে পারি নে—'

সুধানাথ বললেন, 'ফের ওই কথা! তুমি যদি শুধু কায়েত হতে তাহলেও বিয়ে দিতাম। কিন্তু তুমি চোর, তুমি লম্পট, বদমাস আর বিশ্বাসঘাতক। তোমার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে ওকে টুকরো টুকরো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল।'

সেই রাত্রেই নিজের হাতে ঘাড় ধরে সুধানাথ অখিলেশকে বাড়ির বার করে দিলেন।

সুলেখা আর এক ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন বোবা হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে।

জন দুই চেনা ডাক্তারের পরামর্শ নিলেন সুধানাথ। তাঁরা বললেন, 'ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।' সুধানাথের এক বিধবা পিসী থাকেন কাশীর বাঙ্গালী টোলায়। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে মেয়েকে সেখানে রেখে এলেন সুধানাথ।

সুলেখা আপত্তি কবেছিল, প্রথমে কিছুতেই যেতে চায় নি। সুধানাথ বললেন, 'আমাব কথা যদি না শোন, আমি আত্মহত্যা করে মরব। তোমার জন্যে তোমাব ভাই-বোনেরা পথে পথে ভিক্ষে করবে, মা ঝি-গিরি করবে পরের বাড়িতে।'

ছ মাস কাশীতে ছিল সুলেখা। একতলার ছোট্ট অন্ধকার একখানা ঘরের মধ্যে সারাদিন সোনাঠাকুমা তাকে লুকিয়ে রাখতেন। চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখতে দিতেন না। ছ মাস ধরে

প্রতিটি মুহূর্তের সেই দণ্ডভোগের কথা সুলেখা জীবনে ভুলতে পারবে না।

চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখত না, কিন্তু আর একজনের মুখ দেখবার তখনো আশা করত সুলেখা। ভাবত যেমন করেই হোক অখিলেশ তাকে খুঁজে বার করবে। তাকে উদ্ধার করবে এই পাতালপুরী থেকে। পুরুষে না পারে কি! প্রত্যেক পুরুষের মধ্যেই আছে এক দুঃসাহসী রাজপুত্র। রাক্ষসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে চিরদিন নিজের রাজকন্যাকে বুকে তুলে নেয়। নানা গোপন ঠিকানায় লুকিয়ে লুকিয়ে খান কয়েক চিঠি পর্যন্ত লিখেছিল সুলেখা, কিন্তু অখিলেশের কোন জবাব আসে নি।

ছ মাস পরে শেষ হল কারাযন্ত্রণা। কোন হাসপাতাল কি ক্লিনিক-টিনিক কিছু নয়, সেই ছোট অন্ধকূপের মধ্যেই সোনা-ঠাকুমা এক নিশাচরী বুড়ী দাইকে এনে হাজির করলেন। সুলেখার মনে হল যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু প্রাণ গেল না, শুধু ঘণ্টা দুই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রইল সুলেখা। জ্ঞান যখন ফিরে এল সোনাঠাকুমা তার কপালে মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোচ্ছেন। তাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ। আর তোর কোন ভয় নেই সুলি।'

সুলেখা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল সোনা-ঠাকুমা?'

তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'পোড়াকপালী সে কথা শুনে তোর কি লাভ!'

সুলেখা বলল, 'তবু শুনি।'

সোনাঠাকুমা বললেন, 'ছেলে। তার কথা আর ভাবিস নে সুলেখা। সে তোর কোলে থাকবার জন্যে আসে নি। আহা-হা কি চেহারাই না হয়েছে। যেমন রঙ, তেমনি চোখ-মুখ। ঠিক যেন একেবারে রাজপুত্তুর।'

সুলেখা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমরা কি তাকে শেষ করে দিয়েছ?'

সোনাঠাকুমা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'ছি-ছি-ছি। এখানে জীবও যে শিবও সে। তাকে সবচেয়ে ভাল আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা খুব আদর যত্ন করবে। বড় হলে লেখা পড়া শেখাবে।'

সুলেখা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সে আশ্রমের নাম কি ঠাকুমা?'

তিনি পরম স্নেহসিক্ত স্বরে জবার দিয়েছিলেন, 'সে তোর জেনে দরকার নেই দিদি।'

কলকাতায় ফিরে আসবার পরেও বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিল সুলেখা। সুধানাথ তার বিছানার কাছ থেকে নড়েন নি। সুস্থ হয়ে ওঠবার পরেও খুবই আদর যত্ন করেছেন। বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন কয়েকবার কিন্তু সুলেখা রাজী হয় নি। অখিলেশ গোপনে দেখা করতে চেয়েছিল। সুলেখা মত দেয় নি।

বাড়িতে মুখ দেখাবার আর যো ছিল না সুলেখার। ছোট-বড় সবাই তাকে অনুকম্পা করত। লজ্জায় সকলের কাছে মাথা নিচু করে থাকতে হত তাকে। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা ফের সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। শ ছয়েক টাকার ঋণ রেখে

গেছেন সুধানাথ, আর কিছুই রাখেন নি। ভাই-বোনেরা সব নাবালক। তারা আঁকড়ে ধরল সুলেখাকে। দিন ভর টিউশানি করে আর রাত ভর সেলাইয়ের কল চালিয়ে অনশনের হাত থেকে সমস্ত পরিবারকে সুলেখাই তখন বাঁচিয়ে তুলেছে। হীরেন বি-এ পাশ করে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে বেশি মাইনের চাকরি নিলেও বাড়িতে বড়দিদির মর্যাদা সুলেখার একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, মায়া, মমতা নিয়ে ভাই-বোনেরা তার চারি-দিকে ঘিরে রয়েছে। হাসপাতালে নার্সিং-এর কাজে ভর্তি হবার পর অল্পদিনের মধ্যেই তার বেশ সুনাম হয়েছে। শুধু মাইনেই নয়, প্রতিপত্তিও বেড়েছে। সুলেখা বেশ সুখেই আছে একথা অখিলেশকে তার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। মিষ্টি হেসে মধুর ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল সুলেখার কোন দুঃখ নেই, সব ভুলে গেছে সে, তার জীবনেও সিদ্ধি আর সার্থকতা এসেছে।

সত্যি তার কোন দুঃখ নেই। চৌবাচ্চা থেকে আর একবার ভাল ক'রে ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধুয়ে এল সুলেখা। তারপর ফের ঘুমোবার চেষ্টা করল। ঘুম এল না। ফিরে ফিরে নানা কথা নানা চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করে আসতে লাগল।

খানিক বাদে সুলেখা বিস্মিত হয়ে দেখল সে লেবার রুমে শুয়ে আছে। তার চারদিকে মল্লিকা মিনতির দল। তারা সবাই মুখ টিপে টিপে হাসছে। কি লজ্জা! কি লজ্জা! তার কোলের কাছে সেই বাচ্চাটি যাকে নটার সময় সে রীণার কাছে দেখে এসেছে। সেই ফুটফুটে রং, কালো কুতকুতে আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ মেলে সে সুলেখার দিকে তাকিয়ে আছে। আর কি অসম্ভব কাণ্ড!

ভিড় ঠেলে ব্যস্তবাগীশ অখিলেশ ঠিক একেবারে সেইখানে এসে হাজির। ছি-ছি-ছি, একটুও লজ্জা নেই, একটুও ভয় নেই। এযে হাসপাতালের আইন-কানুনের বাইরে। হাউস সার্জনদের ধমক খেয়ে মরবে যে অখিলেশ, আর স্থলেখার চাকরি যাবে।

স্থলেখা কাতরভাবে বলল, 'এখানে আসতে নেই, তুমি বাইরে গিয়ে বসো।'

কিন্তু কোন যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে অখিলেশেব, একটুও যদি লজ্জা ভয় থাকে। স্থলেখাব অনুনয়-বিনয়ে কোন কানই দিচ্ছে না সে, শুধু অপলকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। একবার তাকাচ্ছে স্থলেখার দিকে আর একবার তাকাচ্ছে বাচ্চাব দিকে। বাব বার তাদের ছুঁয়ে দেখতে চাইছে। আর লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে স্থলেখা, 'ছি-ছি-ছি, তোমার কি সবুব সয় না?'

কিন্তু কোন নিষেধ শুনল না অখিলেশ, সত্যি সত্যিই এগিয়ে আনল হাতখানা। ছেলেকে পবম স্নেহে তুলে নিল। একি এতো অখিলেশ নয়, এ যে সেই দাই, কাশীর সেই বুড়ী, মুখপুড়ী দাই।

'নিস্ নে, নিস্ নে, এবার আর নিস্ নে। নিয়ে গেল, এবারও নিয়ে গেল। ও দবোয়ান, ধরো ধরো শিগ্‌গির ধরো ওকে।'

হঠাৎ কেঁদে চেঁচিয়ে উঠল স্থলেখা।

চিত্রা তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরল স্থলেখাকে, 'ও বড়দি অমন করছ কেন, ফের বুঝি তোমাকে সেই বোবায় পেয়েছে। ওঠ, ওঠ, ভাল হয়ে শোও।'

পাশের ঘর থেকে দরজা খুলে ব্যস্ত হয়ে মনোরমা বেরিয়ে এলেন, দুই ভাইও জেগে উঠল।

মা বললেন, 'কি হয়েছে সুলি, অমন করছিস কেন?'

ভাইরা বলল, 'কি হয়েছে বড়দি?'

সুলেখা আস্তে আস্তে বলল, 'কিছু হয় নি। হাসপাতালের স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন!'

মনোরমা অভিযোগের সুরে বললেন, 'দেখবি নে! দিনরাত কেবল হাসপাতাল আর হাসপাতাল। এত করে বলি দুটো দিন ছুটি নে। তাকি মেয়ে শুনবে?

সুলেখা বলল, 'তোমরা ঘরে যাও মা। আমি ফের একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি।'

ঘরের আলো নিবিয়ে ফের শুয়ে পড়ল সুলেখা। চোখের জল ধুয়ে এল না, মুছে ফেলল না। পড়ে তো পড়ুক। অন্ধকারে কে আর দেখবে!

আবার চারিদিক নিঃশব্দ নিঝুম। শুধু শিয়রের কাছে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলোনো হাত-ঘড়ির টিক টিক শব্দ। এই একটানা শব্দ সুলেখাকে কি ফের ঘুম পাড়াবে? না বাকি রাতটুকু আজ আর ঘুমোবে না সুলেখা, জেগে থাকবে। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখবে। তা হলে আর শেষটুকু দেখবার ভয় থাকবে না।

শুভদৃষ্টি

বিশাখা কিছুতেই চোখ মেলল না, আর স্ত্রীর চন্দন-চর্চিত আনত মুখের দিকে তাকিয়ে পলকের জন্য অনন্তের দুই চোখ জ্বলে উঠল, জোড়া ভ্রূর মাঝখানটি কুঁচকে রইল কিছুক্ষণ। কেন না অনন্ত জানে শুভদৃষ্টির সময় বিশাখার এই চোখ না তুলবার মূলে নববধূসুলভ মধুর কোন লজ্জা নেই, আছে তীব্র ঘৃণা আর অবজ্ঞা; কেন না অনন্ত জানে বিশাখা কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে, অনন্ত কুঞ্জ গোঁসাইর রাঁধুনে বামুন আর বিশাখা সেই কুঞ্জ গোঁসাইরই মেয়ে। অথচ যে চোখ আজ বুজে রইল বিশাখা, দু দিন আগে তার সেই চোখই মাঝে মাঝে অনন্তের দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকেছে, অভিমানে কতদিন জলে ভরে উঠেছে সেই চোখ, কত বিদ্যুৎ খেলেছে, কত ইঙ্গিত, কত সংকেত, কত সম্ভাবনার ভাষা বয়ে নিয়ে এসেছে সেই দুটি চোখের দৃষ্টি।

আশে পাশে যারা ছিল তারা বার কয়েক মৃদু অনুরোধ করল, কেউ বা মৃদু একটু ধমকও দিল, 'লজ্জা কোরো না বিশাখা, চেয়ে দেখ, তাকাও ভাল করে, এসময় চাইতে হয়।'

জ্ঞাতি সম্পর্কে ঠাকুরদা নন্দ গোঁসাই এক ঝলক হেসে, মৃদুস্বরে বললেন, 'আহা-হা অত পীড়াপীড়ি করছ কেন তোমরা, শুভদৃষ্টি কি এত দিন লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে হয়েছে, না আজও দেখিয়ে দেখিয়ে হবে?'

বিয়েতে আত্মীয় স্বজন প্রায় কেউ আসে নি। নিতান্ত না এলে

নয়, এমন দু এক জন যারা এসেছিল তাদের মনের গতি কারোরই ভাল ছিল না। কোন আচার-নিয়ম নিয়ে জোর-জবরদস্তি করবার মত মনের অবস্থা এই মুহূর্তে আপাতত কারোরই নেই। এতদিনও তো এরা আচার-বিচারের ধার ধারে নি, আজও না হয় একটু অন্যথাই হল।

সবাই নিষেধ করেছিল কুঞ্জ গোঁসাইকে এমন বিয়ে না দেওয়ার জন্য। বুড়ো মা ব্রজেশ্বরী ছেলের দু'খানা হাত চেপে ধরেছিলেন, 'ছি-ছি-ছি, তোর কি মাথা খারাপ হল কুঞ্জ? অমন সোনার প্রতিমার মত মেয়েকে তুই কিনা একটা রাঁধুনে বামুনের হাতে তুলে দিচ্ছিস! লোকে নিন্দা করবে না শুনলে?'

কুঞ্জকিশোর সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, 'বিয়ে না দিলে লোকে আরো নিন্দা করবে। তার চেয়েও বড় কথা ধর্মের কাছে অপরাধী হতে হবে।' ব্রজেশ্বরী কিছুক্ষণ কুঞ্জকিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'তুই একালের ছেলে নস বাপু।' কুঞ্জকিশোর মৃদু হাসলেন, 'তা হবে, তোমার মত মা কিন্তু সেকালেও ছিল।'

স্ত্রী কনকতারার কাছ থেকে আরো কড়া ধমক এল, 'এর চেয়ে হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দাও।'

কুঞ্জকিশোর বললেন, 'তোমার মেয়ের যদি একটুও বুদ্ধি থাকত কারো ফেলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকত না। হাত-পা তো সত্যিই তার আর বেঁধে রাখি নি।'

কনকতারা বলল, 'তুমি কি পাষাণ? তোমার কি হৃদয় বলে কোন বস্তু নেই?'

কুঞ্জকিশোর হাসলেন, 'আমিও তো সেই প্রশ্নই করছি তোমাকে। তুমিও তো কেবল মান মর্যাদা বিত্ত সম্পত্তির কথা ভাবছ, মেয়েব মনের দিকে একবার চেয়ে দেখছ না। হোক রাঁধুনে বামুন, পুরুষ মানুষ চিরকালই তো আর রেঁধে কাটাবে না। তবু বিশিই যদি তাকে ভালবেসে থাকে—

কনকলতার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল, 'ছাই বোঝ তুমি ভালবাসার। বিয়ের নাম শুনে বিশিই তো ক' দিন ধরে চোখের জলে বালিশ ভেজাচ্ছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ নি তুমি ?'

কুঞ্জকিশোর বললেন, 'দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মুখ দেখাও পাপ, কান পেতে তোমাদের মুখের কথা শোনাও অধর্ম।'

এক দিন দু দিন নয়, সাত বছর ধরে কুঞ্জকিশোর অনন্তকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন। চমৎকার ছেলে। যেমন নম্র তেমন বুদ্ধিমান। আর কুঞ্জকিশোর তো সেই দশ বারো বছর বয়স থেকে ঠাকুরের হাতে খেয়ে মানুষ কিন্তু এমন রান্না তিনি আর কারো হাতে খান নি। মার হাতেও না, স্ত্রীর হাতেও না। আর এই বছর সাতেক যাবৎ শিষ্যবাড়িতে অনন্ত যে শুধু তাকে রেঁধেই খাইয়েছে তাই নয়, শীত নেই, বর্ষা নেই, পূজো নেই, পার্বন নেই, সুদূর পূর্ববঙ্গের জেলা থেকে জেলায়, পাণ্ডববর্জিত অগম্য সব গ্রাম থেকে গ্রামে অনন্ত তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরেছে, দরকার হলে মোট বয়েছে, কৃপণ শিষ্যকে ধমকে গুরুপ্রণামী আদায় করেছে, অসুখে বিসুখে শুশ্রূষা করেছে, দু দু বার নৌকাডুবি আর সাপের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছে। কোন দিন কাজে ফাঁকি দেয় নি, এক

বেলার জন্যও ছুটি নেয় নি, একটা পয়সাও এদিক-ওদিক করে নি অনন্ত'। শিষ্যমহল ঘুরে কুঞ্জকিশোর যখন বিশ্রামের জন্য বাড়ি এসে বসেছেন, অনন্ত এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। কুঞ্জকিশোর সস্নেহে বলেছেন, 'ক'টা দিন বাড়ি থেকে এবার ঘুরে এলেই তো পারতে।'

অনন্ত অল্প একটু হেসেছে, 'আমার আবার বাড়ি।' কুঞ্জকিশোর একবার অবশ্য সে বাড়ি দেখেও এসেছেন, ফরিদপুর জেলায় জলে আর জেলে ভরা, কচুরি আর ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত অতি অখ্যাত এক গ্রাম। দু ঘর বামুন আছে, এক ঘর কায়েত। পৈতৃক ভিটেয় অনন্তের আছে, পড়ো পড়ো একখানা ঘর, গোটা কয়েক আম-কাঁঠালের গাছ আর চার পাশ ঘিরে আগাছার জঙ্গল। মা নেই বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই আছে কেবল বাড়ি একখানা। কুঞ্জকিশোরের দু চোখ জলে ভরে ওঠে। ছুটি পেলেও সে বাড়িতে কেন যেতে চাইবে অনন্ত, তেমন বাড়িতে যাওয়ার জন্য ছুটি সে পেতে চাইবে কেন।

কুঞ্জকিশোর বলেছেন, 'আচ্ছা, দরকার নেই তোমার আর বাড়ি যাওয়ার। তুমি এখানেই থাক।'

খানিক বাদে কি ভেবে আবার একটু হেসেছেন, 'এখানেই থাক, এখানেই বাড়িঘর করে দোব তোমার, বিয়ে-থা দিয়ে দোব। এ দিকে বিয়ে করতে তো কোন আপত্তি নেই তোমার?'

অনন্ত লজ্জিতভাবে মাথা নিচু করে চুপ করে থেকেছে তারপর খানিক বাদে উঠে চলে গেছে রান্নাঘরে।

কারো বারণ শোনে নি অনন্ত। একদিনও বিশ্রাম করে নি,

বসে থাকে নি ; শিষ্য-বাড়িতে যেমন গুরুপাটেও তেমনি রান্নাঘর ছাড়া কোথাও তার মন টেকে না।

বাধা দিয়েছেন কুঞ্জকিশোর, কনকতারা আর বিশাখা কত অনুযোগ করেছে, 'দু দিন জিরিয়ে নাও। নিজের হাতে না রাঁধলে এখানে তো তোমাকে আর উপোস করে থাকতে হবে না।'

অনন্ত কনকতারার দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'কিন্তু সেখানে তো কেউ আর আপনারা সঙ্গে যাবেন না। না রেঁধে রেঁধে মিছামিছি রান্না ভুলে গিয়ে লাভ কি!'

কুঞ্জকিশোর অবশ্য মনে মনে খুশীই হয়েছেন। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে অনন্তের রান্না ছাড়া আর কারো রান্না তাঁর মুখেই রোচে না! কিন্তু সে কথা তো মুখ ফুটে বলবার জো নেই। কনকতারা আর বিশাখাও হাত পা ছড়িয়ে বেশ একটু আরাম বোধ করেছে। সারা বছর তো হেঁসেল ঠেলেই খেতে হয়, অনন্তের কৃপায় দু দিন যদি একটু ছুটি পাওয়া যায় ত, মন্দ কি?

কি দিয়ে অনন্তকে খুশী করবেন, এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তি, এত সেবা যত্নের বিনিময়ে কি পুরস্কার তাকে তিনি দেবেন মনে মনে যখন ভাবছেন কুঞ্জকিশোর, অকস্মাৎ এক অভাবিত, অকল্পিত ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

সন্ধ্যার পর পাড়ায় কীর্তন শুনতে গেছেন ব্রজেশ্বরী আর কনকতারা। শরীর ভাল নয় বলে বিশাখা বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। রান্নাঘরে রান্না করছে অনন্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের পর-পর দুটি স্কন্ধ শেষ করে হঠাৎ একটু তামাকের তৃষ্ণা পেল কুঞ্জকিশোরের। অসুস্থ মেয়েকে ডাকবার ইচ্ছা হল না, ডাকলেন না ব্যস্ত আর শ্রান্ত

অনন্তকে কলকেতে তামাক ভরে আগুন আনবার জন্যে। কুঞ্জকিশোর নিজেই এসে রান্নাঘরের দোরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু কলকেতে আগুন ভরবেন কি রান্নাঘরের আধো খোলা দোরের দিকে তাকিয়ে কুঞ্জকিশোরের মনে হল জ্বলন্ত দু খানি অঙ্গার কে যেন তাঁর চোখের ভিতরে গুঁজে দিয়েছে।

কড়ায় কি একটা তরকারি রান্না হচ্ছে। অনন্ত মাঝে মাঝে খুন্তি দিয়ে একটু আধটু নেড়ে দিচ্ছে তরকারিটা। কিন্তু চোখ তার রান্নার দিকে নেই, মনও নয়, বিশাখা অত্যন্ত ঘন হয়ে মিশে রয়েছে অনন্তের কাছে। থুতনিটা প্রায় মিশেছে অনন্তের কাঁধের সঙ্গে, পরিপুষ্ট বুকের স্পর্শ লাগছে অনন্তের খোলা পিঠে; নির্দ্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বিশাখা বলছে, 'আমি বললাম আরো নুন লাগবে ওতে।'

অনন্ত বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে, 'খুব তো মাস্টারি হচ্ছে। নুনে নুনে পোড়াবে বুঝি তরকারিটা।'

বিশাখাও চোখে চোখে হাসছে, 'পুড়ুক, দু চার দিন একটু বকুনি খাও তুমি; কেবল প্রশংসা আর কেবল গুণগান, অত ভাল নয়।'

'খুব হিংসে হচ্ছে নাকি তোমার?'

'হচ্ছে না? বুক একেবারে ফেটে যাচ্ছে।'

বাইরে থেকে ওদের চোখের হাসি আর ঠোঁটের ভঙ্গি কুঞ্জকিশোর আর দেখতে পেলেন না কিন্তু বুঝতে তাঁর আর কিছু বাকি রইল না। একবার ডাকতে গেলেন বিশাখাকে আর একবার অনন্তকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই আর ডাকলেন না। হঠাৎ ওদের চোখে পড়ে গেলে সমস্ত কালি যেন কুঞ্জকিশোরের মুখে

গিয়েই লাগবে, লজ্জায় তিনি আর মুখ দেখাতে পারবেন না। ওদের কি, ওদের তো আর এখন লজ্জার ভয় নেই, কলঙ্কের ভয় নেই। সমস্ত লজ্জা ভয় ওরা পার হয়ে এসেছে। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ফিরে এলেন কুঞ্জকিশোর। ওদের জানতেও দিলেন না যে তিনি এসেছিলেন।

তারপর দিন তিনেক বাদে জানালেন। জানালেন যে পঞ্জিকা দেখে বিয়ের দিন তিনি ঠিক করে ফেলেছেন। সপ্তাহখানেক বাদেই সেই দিন।

কথাটা শুনে বিশাখা মুহূর্তের জন্য আরক্ত হয়ে উঠল, তারপর রক্তহীন, শ্রীহীন ফ্যাকাশে দেখাতে লাগল তার মুখ। বিস্ময়ের সঙ্গে, ভয়ের সঙ্গে গোপন একটা উল্লাসও দেখা দিয়েছিল অনন্তের মনে, কিন্তু বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে সে উল্লাসেব কিছুমাত্র অবশিষ্ট রইল না, তার বদলে একটা অনমনীয় জেদের ভাব অনন্তের মুখে রূঢ় রুক্ষ ভঙ্গিতে ফুটে উঠল।

কুঞ্জকিশোরের নির্দেশে অনন্ত আর রান্নাঘবে ঢুকল না। খাওয়ার সময় ছাড়া গেল না অন্দর মহলে, বাইরের বাড়ির ঘরে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে দিন কাটাতে লাগল।

অনন্তকে কোন রকম বাগ দেখালেন না, তাড়িয়ে দিলেন না, অপমানজনক কোন কথাই বললেন না কুঞ্জকিশোর, কেবল বললেন, '১৭ই অগ্রহায়ণ বিশাখাকে তোমার বিয়ে করতে হবে। জানাবার মত আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই তোমার নেই। বন্ধু-বান্ধব আছে কিনা জানি নে, তাদের বলতে হয়, নিজের বাড়িতে গিয়ে বল।'

সস্নেহ অনুরোধ নয়, সানন্দ কোন সম্মতি নয়, কেবল রুক্ষ কঠোর এক আদেশ, 'বিশাখাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।'

অনন্তের মনে হ'ল কুঞ্জকিশোর যখন তাকে মোট বইতে বলতেন, তামাক সাজতে বলতেন, আরো ফাই-ফরমায়েশ করতেন পাঁচরকমের, তখনো তাঁর গলা বাৎসল্যে অনেক মধুর, অনেক মিষ্টি শোনাত। মনে অত্যন্ত রাগ হলেও অপরাধীর মত মাথা নিচু করে রইল অনন্ত। কুঞ্জকিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে 'না' বলতে সাহস পেল না।

এক ফাঁকে চুপি চুপি অনন্তের সঙ্গে এসে দেখা করল বিশাখা। অপ্রত্যাশিত আনন্দে অনন্তের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

বিশাখা বলল, 'বাবার কথা শুনেছ বোধ হয়।'

অনন্ত বলল, 'শুনেছি।'

বিশাখা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বাবার মাথার ঠিক নেই। যা-তা করতে পারেন, যা-তা বলে বসতে পারেন, তার চেয়ে তুমি চলে যাও এখান থেকে। পথ খরচ আমি দিচ্ছি।'

অনন্ত বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটু বুঝতে চেষ্টা করল। মনের কথাটা উল্টোভাবে ঘুরিয়ে বলতে ভালবাসে মেয়েরা। ভেবে মনের আনন্দটা সোজাসুজি ভাবেই ঠোঁটের হাসিতে ফুটে উঠল অনন্তের, 'কিন্তু আমাদের বিয়ের দিন যে ঠিক হয়ে গেছে। আজ গেলে কালই তো আবার ফিরে আসবো। যাতায়াতে এত বাজে খরচ করে লাভ কি।'

বিশাখার চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল, 'তুমি বুঝি ওঁর কথা

সব বিশ্বাস করেছ? বাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার সঙ্গে সত্যিই আমার বিয়ে হতে পারে?'.

অনন্তের এবার চমক ভাঙ্গল, অপমানে কালো হয়ে উঠল মুখ, বলল, 'দেখা যাক পারে কি না।'

বিশাখা যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কক্‌খনো নয়, এ কি করে হবে? লোকের কাছে, আমার দিদি, জামাইবাবুদের কাছে মুখ দেখাব কি করে? তুমি চলে যাও, পায়ে পড়ি তোমার; তুমি এক্‌খুনি চলে যাও এখান থেকে।'

অনন্ত কিছুক্ষণের জন্য অবশ্য সরে গেল কিন্তু বেশি দূর গেল না; গিয়ে বসল ফের সেই বাইরের ঘরে।

বিশাখা ফিরে গেল ঘরে, মার কাছে গিয়ে বলল, 'আমি বিষ খেয়ে মরব।'

কনকতারা বলল, 'তুই তাই মর।'

বিশাখা রুখে উঠল, 'কেন কি হয়েছে, কি করেছি, কি এমন জাত গেছে আমার যে একটা রাঁধুনে বামুনের সঙ্গে জোর করে তোমরা আমার বিয়ে দিতে যাচ্ছ? আসলে তোমাদের মতলব আমি জানি। বিনা পয়সায়, বিনা খরচে কাজ হাঁসিল করতে চাও।'

কথাটা কনকতারার বুকে বিঁধল, মেয়েকে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। যা মুখে আসে তাই বলবি, এত স্পর্ধা হয়েছে তোর।'

স্পর্ধা! হাত পা বেঁধে বিশাখাকে ওরা জলে ফেলে দিতে চাইছেন আর তাতে আপত্তি করলেই সেটা স্পর্ধা হয়ে গেল! তার সমস্ত জীবন, সমস্ত ভবিষ্যৎকে মাটি করে দিচ্ছেন আর মুখ ফুটে একথা বিশাখা বলতে পারবে না, মহাভারত তাতে অশুদ্ধ হয়ে

যাবে। বিশাখা তো জানে এমন কোন মহাপরাধ সে করে নি যাতে অনন্তের সঙ্গে বিয়ে না দিলে নিন্দা হবে, কেলেঙ্কারি হবে। একটু হাসি-ঠাট্টা, একটু ছোঁয়া-ছুঁয়ি চাওয়া-চাওয়ি, মাত্র তো এই! সে সব তো ইচ্ছা করে করেছে বিশাখা মজা দেখবার জন্যে, ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে অনন্তকে।

তা দেখে তার বাবা যে ক্ষেপে যাবেন একথা কে ভেবেছিল।

বিয়ে! এই একুশ বছর বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো থাকলেও বিয়ের মানে যে কি তা তো বিশাখা বোঝে। এ যে কেবল একটু ছোঁয়া-ছুঁয়ি চাওয়া-চাওয়ি নয়, কেবল হাসি-ঠাট্টা ইসারা-ইঙ্গিত নয়। এ যে অত্যন্ত স্পষ্ট, অতি উচ্চারিত; এ যে চিরদিনের জন্য সমস্ত জীবন আর একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া, তা বুঝতে বিশাখার বাকি নেই। এক আধ সময়ের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে এক আধটু হাসি-পরিহাস অনন্তের সঙ্গে চললেও আলো জ্বেলে বাসর সাজিয়ে সমাজের দশজনের সামনে বাপের রাঁধুনী বামুনের সঙ্গে যে বিয়ে চলে না, একথা কি বিশাখাকে শিখিয়ে দিতে হবে?

তবুও যথাসময়ে বিয়ের দিন এল। ধোপা-নাপিত এসে তাদের আচার সারল, পুরোহিত মন্ত্র পড়ল, পড়াল, লোকজন খেল, ছেলেরা ছুটোছুটি করল, পাড়ার বউ-ঝিরা সেজে-গুজে এসে হাসি-তামাসা রসিকতা করল, আচার-অনুষ্ঠানের কিছু বাকি রইল না। কিন্তু বিশাখা কিছুতেই ভুলতে পারল না—দু চারদিন সামান্য একটু মাখামাখি করার অপরাধে বাড়ির রাঁধুনীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে।

কুঞ্জকিশোর জামাইকে নিজের বাড়ির কাছেই একটু জায়গা দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন গাঁয়ের বাজারে একটা মুদি দোকান দিয়ে দিতে, কিংবা তা যদি পছন্দ না হয়, সহরে শিষ্য সেবকদের ধরে অনন্তের উপযোগী কোন ভদ্ররকমের কাজকর্ম জুটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু এক বিশাখাকে ছাড়া শ্বশুরের কাছ থেকে কোন দান, কোন অনুগ্রহ নিতেই অনন্ত রাজী হয় নি।

কোনরকম বাধা নিষেধ, অনুরোধ উপরোধই অনন্ত কানে তুলল না। বিয়ের অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীকে নিয়ে তুলল নিজের সেই জঙ্গলা ভিটেয়, ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে।

বিশাখা ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট উল্টে বলল, 'এই তোমার বাড়ি?'

অনন্ত বলল, 'কেবল আমার বাড়ি বলছ কেন, এখন তোমারও তো।'

বিশাখা যেন ধমক দিয়ে উঠল, 'ন্যাকামি রাখ। এই জঙ্গলের মধ্যে একটা দিনও আমি থাকতে পারব না তা বলে দিচ্ছি।'

অনন্ত বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বিশাখার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর দা আর কুড়ুল নিয়ে বেরুল আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করতে।

দু তিন দিনের চেষ্টায় দু একজন প্রতিবেশীর বাড়ির উঠান আর চারদিকটা বেশ একটু পরিষ্কারও হল। কিন্তু বিশাখার মনের জঙ্গল অত সহজে নির্মূল হল না, অরণ্য যেন গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠল।

অভাব অনটন খুব বেশী নয়। বিঘা কয়েক জমি আছে অনন্তের

মাঠে। বাড়ি থাকত না বলে তার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নেই তা ভোগ করত। অনন্ত তার কবল থেকে উদ্ধার করল জমি, ফসল আনল ঘরে। বাড়ির উত্তর সীমায় দুটো বড় বড় কড়াই গাছ ছিল। বিক্রি করে জুটল কিছু নগদ টাকা। কিছু রেখে দিল দৈনন্দিন হাট বাজারের জন্য আর টাকা পনের খরচ করে স্ত্রীর জন্য একখানা রঙীন শাড়ী কিনে আনল অনন্ত।

কিন্তু সমস্ত রঙ যেন বিশাখার মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে। অনন্তের উৎসাহ আর উল্লাসে খুশী হওয়া থাক, বিশাখার সমস্ত অন্তর যেন রাগে আর অপমানে জ্বলতে লাগল। অনন্ত তো খুশী হবেই, উল্লাস তো তার মনে আসবেই। প্রভু-কন্যাকে সে বিয়ে করে এনেছে। কিন্তু দাসের দাসী সেজে বিশাখার আনন্দ কোথায়, গৌরববোধের হেতু কোথায় তার ?

গাছ বেচা টাকায় এক হাতে দুধের হাঁড়ি আর এক হাতে মাছের খালুই নিয়ে বাজার করে ফিরল অনন্ত। স্ত্রীর সামনে বাজার নামিয়ে রেখে সোৎসাহে বলল, 'বেশ টাটকা ইলিশ মাছটা। দেখছ কি রকম সাদা-পুরু, মাথা ছোট, গোলগাল গড়ন। বেশ হবে দেখ। এক কাজ কর—ঝোলের মধ্যে কচি, ডাঁটা ফেলে দাও দু-একখানা, আর কচুর শাকে মাথায় করো ঘণ্ট, চমৎকার স্বাদ হবে।'

বিশাখার মনে পড়ল মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও রান্নার এসব নির্দেশ উপদেশ অনন্তকে সে আর তার মা-ই দু বেলা দিয়ে এসেছে। আর আজ দু ছত্র সংস্কৃত মন্ত্রে ভোজবাজির মত দুনিয়া

গেছে উল্টে। বাড়ির ঠাকুর অনন্ত হয়েছে কর্তা, আর বিশাখা হয়েছে তার রাঁধুনী।

কি মনে করে বিশাখা হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, বলল, 'অত সব আমি পারব না।'

অনন্ত স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'তার মানে ?'

বিশাখা বলল, 'মানে আবার কি। রাঁধতে আমি জানি নাকি যে রাঁধব ?'

অনন্ত তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, 'হারামজাদী, নচ্ছার মাগী রাঁধতে জানিস নে—স্বামীর সামনে সে কথা বলতে লজ্জা হয় না তোর ?'

বিশাখা বলল, 'ঈস, তুদিনের যোগী ভাতেরে বলে অন্ন। স্বামী! কদিন হল স্বামী হয়েছ ? কি ছিলে মনে নেই ?'

অনন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল তারপর বলল, 'আছে। কিন্তু সেদিন আর নেই। তুই না রাঁধিস, তোর ঘাড়ে রাঁধবে, তোর বাপ এসে রেঁধে দেবে হারামজাদী।'

অনন্ত রাগে গরগর করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ জেদ করে বসে রইল বিশাখা, বাপ-মাকে গাল দিল, নিজের ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করল। কিন্তু খিদেয় পেটের ভিতর যখন জ্বালা করতে সুরু করল, মনের জ্বালা ভুলে উনানের কাছে গিয়ে বিশাখা রাঁধতেও বসল।

খেতে বসে অনন্ত এটা ফেলল, ওটা ছুঁড়ল। বলল, কিচ্ছু হয় নি, কোন স্বাদ হয় নি কোন তরকারিতে।

আর স্বাদ, জীবনেই কোন স্বাদ নেই বিশাখার, রান্নায় স্বাদ আসবে কোত্থেকে?

বিশাখা বলল, 'যা পেরেছি করেছি, পছন্দ না হয় নিজে এসে রেঁধে খাও।'

অনন্ত ধমক দিয়ে উঠল, 'আবার সেই কথা, গায়ের রাগে তাই বলে তুই আমার জিনিসপত্র নষ্ট করবি নাকি মাগী? এগুলি মাগনা আসে, না তোর বাবা এসে মাথায় বয়ে দিয়ে যায়? টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না এগুলি?'

এমন দিন যায় না কোন না কোন উপলক্ষে ঝগড়া খিটিমিটি লাগে না দুজনের মধ্যে। পাড়াপড়শীরা অবাক হয়ে ভাবে—দু'মাস কাটতে না কাটতে এদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর এমন চিরন্তন সম্পর্ক স্থাপিত হল কি করে।

এমনিতে অনন্ত বেশ ভালমানুষ, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্‌ভাব রেখে চলে, মিষ্টিমুখে কথা বলে, বিয়েতে শ্রাদ্ধে খেটে দিয়ে আসে, বামুনকায়েতের বাড়ি হলে রান্নাঘরেরও ভার নেয়। কিন্তু ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব যায় বদলে, বিশাখার প্রতিটি আচার-আচরণে স্বামীর প্রতি তার অবহেলা অবজ্ঞা আর উদাসীনতা আবিষ্কার করে, কোন দিন বা অকথ্য গ্রাম্য ভাষায় গালাগালি দেয় স্ত্রীকে, কোন দিন বা স্বামীভক্তির আদর্শ সম্বন্ধে জোর গলায় বক্তৃতা দেয়!

কেবল অনন্তই নয়, স্বামীভক্তি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে চিঠি আসে বিশাখার মার কাছ থেকে, আসে তার দিদি ললিতার কাছ থেকে। কনকতারা লেখে, স্বামী যেমনই হোক তাকে অবজ্ঞা অনাদর করা

পাপ। বিশাখার দিদি ললিতাও প্রায়ই সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি লেখে। বাপের দোষ তো আছেই কিন্তু নিজের দোষে জীবনটাকে যেন মাটি না করে বিশাখা। তার চেয়ে অনন্তকেই যেন বেশ একটু ঘষে-মেজে নেয়।

উপদেশ শুনে বিশাখা মনে মনে হাসে। ললিতার ভাগ্য অন্য রকম। স্বামীকে তার ঘষে-মেজে নিতে হয়নি, স্বামীই ঘষে-মেজে তার রূপ বাড়িয়েছে, গৌরব বাড়িয়েছে। না হলে বিশাখা তো জানে, তার দিদি ললিতা তার স্বামীকে চিঠিখানা পর্যন্ত লিখতে জানত না। প্রাইভেট টিউটরের কাছে খান-কয়েক পাঠ্য বই আর ঝুড়িখানেক নভেল পড়া বিদ্যা নিয়ে দিদির চিঠি বিশাখা নিজে লিখে লিখে দিত। আর আজ বছর-কয়েক উকিল স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসার করে এক রকম পাকা মুসাবিদা শিখেছে ললিতা, কথায় কথায় তার কত মুন্সিয়ানা! দিদির চিঠি খুলে তার ডান ধারের মাথায় ইংরাজীতে লেখা ঠিকানাটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকে বিশাখা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ললিতার স্বামীর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া বি. এ, বি. এল উপাধিটুকু। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অনন্তের কথা। ভাগ্যের ওপর আক্রোশে মুহূর্তের জন্য দু চোখ জ্বলে ওঠে, পর মুহূর্তে অভিমানে জলে ভরে যায়। ইতিমধ্যে বাপের বাড়ি থেকে জ্ঞাতি সম্পর্কে জেঠতুতো ভাই দু দুবার এসেছে নিতে। কিন্তু বড় বড় কথা বলে বিশাখা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বাপের চিঠির জবার দেয় নি, মাকে অসংখ্য খোঁটা দিয়ে চিঠি লিখেছে।

কিন্তু ললিতা এবার চিঠি লিখল নতুন খবর দিয়ে। তার বাপ-মা-মরা একটা ভাসুরঝি আছে। তাকে বিয়ে দেওয়ার ভার

পড়েছে ললিতাদের ওপর, টাকাপয়সার সংস্থান যে ভাবেই হোক হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে টাকাপয়সাই তো যথেষ্ট নয়, দেখা-শুনা তত্ত্বাবধান কে করবে। ঘরে শাশুড়ী ননদ কেউ নেই, কোলের রোগা ছেলে নিয়ে ললিতার পক্ষে কি সম্ভব একা একা এই ঝক্কি সামলানো? তাই বিশাখাকে যেতেই হবে, একা নয়, একেবারে বরকে সঙ্গে করে। নিজের ভাসুরঝির বিয়ে হবে বলে সন্ত বিবাহিত বোন আর ভগ্নীপতির মধ্যে বিরহ ঘটিয়ে তাদের শাপ মন্যির ভাগী হতে চায় না ললিতা। বিশাখাও আসুক, অনন্তও আসুক, গাড়ীভাড়ার টাকা মনিঅর্ডারে যাচ্ছে।

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই অবশ্য টাকা এসে গেল। বিশাখা একবার এগোয় একবার পিছোয়। যাবে না। লোভ আছে ট্রেনে করে নতুন জায়গায় নতুন শহরে যাওয়ার। লোভ আছে বিয়ে-বাড়ির উৎসবে আমোদ আহ্লাদ করবার, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও আছে। অনন্তের মত স্বামীকে নিয়ে অমন বিদ্বান বুদ্ধিমান মান্যগণ্য ভগ্নীপতির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সে কোন্ মুখে? মুখে কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু মনে মনে সবাই তো হাসবে বিশাখার পছন্দ দেখে, তাদের পূর্বরাগের কথা স্মরণ করে। দেশ-বিদেশের কত বড় বড় চাকুরে, বড় বড় বিদ্বান আসবে সেখানে। কেবল বিশাখার স্বামী অনন্তেরই কোন পরিচয় থাকবে না, খ্যাতি থাকবে না, অথচ একথা সকলেরই মনে থাকবে দীর্ঘকাল, অনন্ত বিশাখার বাবার রাঁধুনে বামুন ছিল। এমন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যেন নিজের খাঁদা নাকে আঙ্গুল দিয়ে দশজনকে ডেকে দেখিয়ে বেড়ানো। ভাবতেই লজ্জা হল, বিশাখার অস্বস্তি লাগতে লাগল।

তবু বিয়ের বাড়ি ত, লোভটা যেতে চায় না, অথচ অন্য কোন লোকও নেই যার সঙ্গে বিশাখা যেতে পারে, এমন সময়ও নেই দিদিকে লেখে লোক পাঠাবার জন্য। বিশাখা মনে মনে বুঝল তার দিদি ললিতা এই সুযোগে মজা দেখতে চায়। দুঃখে অভিমানে বিশাখার ঠোঁট ফুলে উঠল। বেশ দেখুক মজা। নিজের বোনকে দশজনের সামনে অপদস্থ করে ললিতার নিজেরই কি মান বাড়বে?

সঙ্গে নেওয়ার আগে স্বামীকে সাধ্যমত ঘষে-মেজেই নিল বিশাখা। পরিষ্কার জামা কাপড় পরাল, উপদেশ দিল সেখানে গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকে থাকতে, রোজ নাপিত ডেকে দাড়ি কামাতে, খুব কম কথা-বার্তা বলতে, বুঝে শুনে চলতে। আর খবরদার, সেখানে গিয়ে মোটেই রান্নঘরের কাছে ঘেঁষবে না, রান্নাবান্নায় হাত ছোঁয়াতে যাবে না মোটেই।

স্ত্রীর ভাবভঙ্গিতে মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ আর অপমানিত হলেও তেমন প্রতিবাদ করল না অনন্ত। সস্ত্রীক কুটুম্ববাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার লোভ তারও ছিল। বিশাখা যে তার স্ত্রী, একথা কেবল গাঁয়ের লোকই নয়, ভিন্ন গাঁয়েব লোকও দেখুক, বিশাখার আত্মীয়-কুটুম্বেরা প্রত্যক্ষ করুক। না হলে অনন্তের গৌবব আর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে কি ক'রে?

ললিতা আর নিরঞ্জন বিশাখাদের দেখে খুব খুশীই হল। বিশাখা যেমন মনে করেছিল আচারে ব্যবহারে ভগ্নী-ভগ্নীপতির তেমন কোন বিসদৃশতা বিশাখার চোখে পড়ল না। অনন্তকে তারা কোন রকম অনাদর অবজ্ঞা করল না, তার আগেকার পেশা সম্বন্ধে কোন কটাক্ষ করল না, নিরঞ্জন ভায়রার সঙ্গে পাশাপাশি বসে খেল,

মুখোমুখি বসে তাস পাশা খেলল, ভাইঝির আসন্ন বিয়ে সম্বন্ধে পরামর্শ করল, বিদ্যায় বুদ্ধিতে সম্মানে প্রতিপত্তিতে অনন্তকে তার বড় ভায়রার চেয়ে অত্যন্ত বেশি ছোট, একথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কারোরই তেমন গরজ দেখা গেল না। তবু এদের অতি সতর্কতা, এই অতি সন্তর্পণের ভাব বিশাখার মনকে মাঝে মাঝে খোঁচা দিতে লাগল। তার স্বামী সত্যিই যদি তার সমকক্ষ হত তাহলে এরা আর এমন পা টিপে টিপে চলত না, বিশাখাকেও কেবল ইসারা ইঙ্গিতে আর গা টিপে টিপে স্বামীকে সাবধান সতর্ক করবার জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকতে হত না। অনেক গেছে আর অল্প আছে, বাকি কটা দিন কাটলে অনন্তকে নিয়ে সে এখান থেকে নামতে পারলে বাঁচে। এমন ভয়ে ভয়ে আর কাঁহাতক থাকা যায়!

অনন্তও বিরক্ত কম হয় নি। স্ত্রীর চোখের ইশারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কতক্ষণ আর মানুষ সামলে চলতে পারে! মনে মনে ভারি রাগ হয় অনন্তের, দাঁতে দাঁত ঘষে আর ভাবে একবার এখান থেকে বেরতে পারলেই হয়, বিশাখার এই চোখ নাচাবার মজাটা হাড়ে হাড়ে তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে অনন্ত ছাড়বে না।

ললিতার ভাসুরঝি গৌরীর বিয়ের দিন এসে গেল, উৎসব আনন্দে মেতে উঠল বিশাখা। কিন্তু স্বামীর চাল চলন ভাব ভঙ্গির দকে চোখ রাখতে সে ভুলল না।

রান্নাঘরে রকম-বেরকমের রান্না হচ্ছে, ভিয়েন বসেছে লুচি ভাজবার জন্য, আর ধোপ-দুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি পরে অনন্ত কেবলই সেইদিকে ঘোরাঘুরি করছে। ভারি ইচ্ছে হচ্ছে অনন্তের একবার গিয়ে বসে সেখানে, নিজে হাতে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। এত সব

দামী দামী জিনিসপত্র যে ওরা নষ্ট করে ফেলবে সে আশঙ্কা কিছুতেই অনন্তের মন থেকে যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে দু তিন বার স্বামীকে চোখে চোখে শাসন করেছে বিশাখা, মৃদুকণ্ঠে ধমকও দিয়েছে—'ফের আবার এখানে এসেছ, ওই সব হাতা খুন্তি নিয়ে নাড়াচাড়া ঘাঁটাঘাঁটি না করতে পারলে বুঝি আর মনে শান্তি হবে না তোমার? আমি মাথা খুঁড়ে না মরলে বুঝি আর এখান থেকে যাবে না তুমি?'

দাঁত কিড়মিড় করেছে অনন্ত, হাত উঠেছে নিশপিশ ক'রে, কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে অনন্ত কোন কথা না বলে নিঃশব্দেই বার বার সরে গেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, একবার গাড়িতে উঠতে পারলে হয় তারপর স্ত্রীর ধমকানির আর চোখ রাঙানির শোধ অনন্ত ভালো করেই তুলবে।

বিয়ে শেষ হল। বাসি বিয়ের দিনে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে দুপুরে। লোকজন যে খুব বেশি খাবে তা নয়, বরযাত্রীরা কজন যারা আছে তারা, আর নিরঞ্জনের জন-কয়েক সমব্যবসায়ী উকিল বন্ধু, মুনসেফ, কোর্টের পেস্কার আর আমলা। এর জন্য আর রাঁধুনী বামুন আনাবার কি দরকার? ললিতা বলল, রান্নাঘরের ভার তারা দু বোনেই নেবে, সেজন্য চিন্তা নেই, বাইরের দিকটা যেন দু ভায়রায় দেখে।

কিন্তু ভোরে উঠে দেখা গেল ললিতা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। একেই ত দুর্বল শরীর, তারপর এ ক' দিনের খাটুনিতে আরও ক্লান্ত আর দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাত্রে বমি হয়েছে বার কয়েক, দুর্বলতায় মাথা খাড়া করবার সাধ্য নেই।

রান্নার সমস্ত ভার গিয়ে পড়ল বিশাখার ওপর। অন্য দু একটি মেয়ে যারা ছিল তাদের কাউকেই ডেকে পাওয়া গেল না। কেউ বা কনের সঙ্গে গল্প করতে বসেছে, কেউ বা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, রান্নাঘরের ধারেও কেউ ঘেঁষছে না।

বিশাখা মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, নিমন্ত্রণের রান্না তো ভাল, ঘরের রান্নাও সে বাপের বাড়িতে সমানে দু বেলা করে নি। ভাল কোন মাছ তরকারি রাঁধতে হলে বিশাখার মা নিজে রেঁধেছে। অনন্ত থাকলে রেঁধেছে অনন্ত। আজ বিদেশে বিভুঁয়ে কুটুম্ব স্বজনের বাড়িতে এসে রান্না নিয়ে যে তাকে এমন বিপদে পড়তে হবে তা সে ভাবতেও পারে নি। ভাল রান্না জানে না একথা ভগ্নীপতির কাছে স্বীকার করতে তার বাধল, আবার এমন আশঙ্কাও হতে লাগল যে রান্না ভাল না হওয়ার জন্য লোকে যদি খেতে না পারে, জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে যায়, তাহলেই বা ভগ্নীপতির কাছে মুখ দেখাবে কি করে! চরম বদ্‌নাম নিয়ে ফিরতে হবে এখান থেকে।

ভয়ে ভয়ে দু একটা পদ রাঁধল বিশাখা। একবার চাখতে দিল একটি মেয়েকে। তার মুখের নিন্দায় বিশ্বাস না করে আর একবার নিজেই চেখে দেখল। কিন্তু তরকারির স্বাদে বিশাখা নিজেই মুখ বাঁকাল। জিহ্বাই শত্রুতা করছে তার সঙ্গে না নিজের হাত, বিশাখা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

এত লোক খাবে, এত দাম দিয়ে কেনা জিনিসপত্র—বিশাখা যেমন বিব্রত হল তেমনি বিরক্ত হয়ে উঠল। যে দু একটি মেয়ে সাহায্য করতে এসেছিল—বিশাখার কথার ধারে তারাও কোন না

কোন অজুহাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফলে আরও বিচলিত হল বিশাখা, আরও ঘাবড়ে যেতে লাগল!

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন আলগোছে আঙুল ছোঁয়াল তার কাঁধে। বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল বিশাখা। কিন্তু স্বামীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নতায় মুখ তার কোমল হয়ে উঠল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, এতক্ষণ কেন মনে পড়ে নি অনন্তকে।

বিশাখা আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি'! গলাব স্বরে মনের আনন্দ গোপন রইল না। অনন্ত সে কথার কোন জবাব দিল না, বলল, 'আর একটু হলেই দিয়েছিলে তরকারিটা নষ্ট করে। অতখানি ঝাল আর নুন খাটে নাকি ওতে?'

বিশাখা খানিকটা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি খানিকটা লঙ্কা বাটা কমিয়ে রাখল। রান্নার ব্যাপারে স্বামীর এই মৃদু তিরস্কার আর নির্দেশ উপদেশ প্রণয়-সম্ভাষণের চেয়েও মধুব লাগল কানে। সহাস্যে নিজেব দোষ আজ স্বীকার কবল বিশাখা, বলল, 'ঝাল নুন তো চিরকালই আমি একটু বেশি বেশি খাটাই।'

অনন্ত বলল, 'কিন্তু তা আমার জিভে সয় বলে আর সবার জিভেও সইবে না কি?'

'না সয় না সইবে। বয়ে গেল।'

মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিশ্চিন্তভাবে এবার রান্নায় মন দিল বিশাখা। এতদিন বাদে অনন্তেব সঙ্গে ফের যেন তার সেই পূর্বরাগের পালা ফিবে এসেছে।

হুকার

বেশ একটু বেলায় ওঠা অভ্যাস বলে সকালে কাগজের হেড-লাইনগুলি ছাড়া ভিতরের খবরগুলি পড়ে দেখবার আমি কিছুতেই সময় করে উঠতে পারি নে। তাছাড়া দুখানা কাগজই সকাল থেকে বেশ কিছুক্ষণ মণিমালার দখলে থাকে। আজ কিন্তু অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক ভোরেই ঘুম ভেঙে গেছে। চায়ের কাপের সঙ্গে কবোষ্ণ খবরের কাগজগুলিও ভাঁজ-না-ভাঙা অবস্থায় আমার টেবিলে এসে পৌঁছেচে। কিন্তু আজকের কাগজে গুরুতর রকমের জরুরী সব খবর থাকবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও হেডলাইনগুলিতে পর্যন্ত একটু চোখ বুলিয়ে দেখবার উৎসাহ পাচ্ছি না। কাগজগুলি যেমন ছিল তেমনিই পড়ে আছে। ভারি খারাপ লাগছে মন। অথচ কারণটা কতই না সামান্য। আর যে ঘটনাটুকু ঘটেছে বলে মন আমার এত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, বলতে গেলে তার জন্য খুশী আর নিশ্চিন্ত হওয়াই তো আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। নিজের মনকে তো আর সব সময় আঁখি ঠেরে রাখা যায় না। এতকাল আমার স্ত্রী মণিমালার বিশেষ একটি প্রিয়বস্তুর জন্য কি খুঁৎখুতি আর অস্বস্তিই না মাঝে মাঝে বোধ করেছি, আজ সেই খুঁৎখুতির কারণটা নিজের চোখের উপর যখন এমন করে ভেঙে পড়ল, তখনো তো স্বস্তি পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে যেন একটি সুখস্বপ্নই ভেঙে গেছে। বিয়ের বছরখানেক পরে কথাটা আমার প্রথম কানে গিয়েছিল। সারপেনটাইন লেনে থাকে আমার দূরসম্পর্কের এক

পিসতুতো ভাই সুবিমল। ঠিকানাটাই তার কলকাতার। কিন্তু বছরের বেশির ভাগ সময়ই কি একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্সি নিয়ে কলকাতার বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। কালেভদ্রে কদাচিৎ দেখা হয় তার সঙ্গে। আমার বিয়ের সময় সে থাকতে পারে নি। বিয়ের এক বৎসরের মধ্যেও কোন যোগাযোগ হয় নি তার সঙ্গে। হঠাৎ মৌলালির মোড়ের রেস্টুরেন্টটিতে দেখা। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে সুবিমল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আরে, তুমি নাকি আমাদের পাড়ার গণেশ উকিলের মেয়েকে বিয়ে করেছ ?'

ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগে নি। উকিল আমার শ্বশুরের পদবী নয়, ওকালতি পেশা। সুবিমলের পাড়ায় তিনি থাকেন বলেই অমন তাচ্ছিল্যের সুরে তাঁর নামটা আমার কাছে উচ্চারণ করবার কোন দরকার ছিল না সুবিমলের।

গম্ভীর স্বরে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী গণেশবাবুরই মেয়ে। গণেশবাবু স্মলকজ কোর্টেই প্র্যাক্টিস করেন।'

সুবিমল হেসে জবাব দিয়েছিল, 'হয়েছে হয়েছে। তিনি যে কোথায় কি রকম প্র্যাক্টিস করেন তা আমাকে আর বলে দিতে হবে না। জন্মাবধি আড্ডা দিয়ে আর তাস খেলে বেড়াচ্ছি তার সঙ্গে, আর তুমি এসেছ তাকে চেনাতে।'

আমার শ্বশুরের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আর সুবিমল এখনো তিরিশ পেরোয় নি। অবশ্য একটু অল্পবয়সী ছেলে-ছোকরা-দের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস আছে গণেশবাবুর। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও অসমবয়সীদের ভিতরেই বেশি। কিন্তু সুবিমলের

সঙ্গে যে তাঁর খুব হৃদ্যতা আছে তা এর আগে শুনি নি। সুবিমলকে কোনদিন দেখিও নি তাঁর বাড়িতে।

চুপচাপ চা খেয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ সুবিমল আবার বলল, 'তা কি রকম পেলে-টেলে?'

বললুম, 'পাওয়া-টাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমার কোন দাবীদাওয়া ছিল না। যা দিতে পেরেছেন তাই নিয়েছি।'

'ঈস, একেবারে পুরোপুরি ভালো ছেলে বনে গেছ দেখছি—গোপাল যাহা পায় তাহাই খায়। না কি, a beautiful face is all conquering. সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। Translation মুখস্থ করেছিলাম ছেলেবেলায়।'

আমি এবারও কোন জবাব দিলাম না। একবার ইচ্ছা হল বলি, 'তোমার ছেলেবেলা কি এখনো ঘুচেছে?' কিন্তু কিছু বলবার বদলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি অন্য টেবিল থেকে দুমড়ানো খবরের কাগজটি টেনে নিলাম। বিকালের দিকে কাগজের আর কোন পদার্থ থাকে না এসব রেস্টুরেন্টে। মাংসের ঝোলে, চায়ের লিকারে একেবারে বিচিত্র বর্ণ হয়ে যায়। দেখলাম সুবিমলও তা লক্ষ্য করেছে। আমার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে সুবিমল বলল, 'আরে রেখে দাও। বাসি কাগজ কি পড়বে? কেন, বাড়িতে পেপার রাখো না সকালে?'

'তা রাখি বই কি।'

'খুব বেলায় পাও বুঝি কাগজ? অফিসের তাড়ায় পড়বার সময় পাও না।'

বললুম, 'না, উঠি বেলায় কিন্তু কাগজ পাই খুব সকালেই। এদিক থেকে হকার-ভাগ্য আমার খুব ভাল।'

সুবিমল বলল, 'ভাল হলেই ভাল। বিবাহিত লোকের কিন্তু নিজের বলতে কোন ভাগ্য নেই, সব স্ত্রীভাগ্য।'

বললুম, 'স্ত্রীভাগ্যে ধনের কথা বলছ তো? আজকাল কিন্তু ও প্রবচন আর ফলে না ভাই।'

সুবিমল মুখ মুচকে একটু হাসল, 'আর একটি নতুন প্রবচন কিন্তু মাঝে মাঝে ফলতে দেখা যায়। স্ত্রীভাগ্যে খবরের কাগজ। আচ্ছা, বিয়ের পর পুরোনো হকাবই আছে, না নতুন হকার এসেছে তোমাদের?'

বললুম, 'তা তো খবর রাখি না।'

সুবিমল মৃদু একটু হাসল, 'কেবল খবরের কাগজই রাখো বুঝি। বেশ, বেশ। সে খবরটাও কিন্তু প্রায় কাগজে বেরুবার জো হয়েছিল। আমরা মাঝখানে পড়ে চেপে দিয়েছি।'

বললুম, 'কোন্ খবরটা?'

সুবিমল দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এতদিনেও যদি না জেনে থাকো জানবার দরকার নেই। ঘাবড়িয়ো না, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। বছরখানেক কি বছর দেড়েক আগেকার আমাদের গণেশদার বাসার সামান্য একটি হকার-এপিসোড। কেন এতদিন শোন নি তুমি? এপাড়ার সবাই তো সে কথা জানে।'

বললুম, 'আমার তো আর এপাড়ায় বাস নয়।'

সুবিমল বলল, 'আহাহা, শ্বশুরের বাস তো বটে। কি একটা কথা আছে না। অসারে খলু সংসারে—'

ইতিমধ্যে আরো জন দুই বন্ধু এসে জুটল সুবিমলের টেবিলে। কাউন্টারে দুকাপ চায়ের দাম দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। এসব এপিসোডের ব্যাপারে সুবিমল চিরকালই কিছু বেশি রকম উৎসাহী। ওর কথা আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। তবু ইঙ্গিতটা যেহেতু নিতান্তই নিজের স্ত্রী-সংক্রান্ত, মন থেকে কৌতূহলটা একেবারে মুছে গেল না বরং মাঝে মাঝে খোঁচাই দিতে লাগল। কিন্তু হকার! হকার মানে কি?

খবরের কাগজ সম্বন্ধে সত্যিই আমার একটু নিস্পৃহতা আছে। চেষ্টা করেও আমি পরিমিত রকমের সংবাদ-সন্ধানী হতে পারি নি। বিশেষ করে সকাল বেলা খবরের কাগজ নিয়ে উপুড় হয়ে থাকাটা কিছুতেই আমার অভ্যাসগত হয়ে উঠল না। তথ্যের চেয়ে তত্ত্ব-মূলক একটু সিরিয়স ধরনের পড়াশুনো করতেই আমার সকালে ভাল লাগে। কিন্তু মণিমালার স্বভাব একেবারে উল্টো। ভারি খবর-প্রিয় মণিমালা। একটি ঠিকে ঝি ছাড়া বাসায় আর কোন চাকর বাকর নেই। ছোট ভাইবোন আছে তিনটি। সংসারের কাজকর্ম ছাড়াও তাদের অভিভাবকত্ব করতে হয় মণিমালাকে। সকাল থেকেই লাগতে হয় কাজে। ভোরের চা, জল-খাবারের ব্যবস্থা, স্কুল অফিসের রান্নার উদ্যোগপর্ব যখন শুরু হয় তখন হয়তো ভাল করে দিন শুরু হয় না। কিন্তু খুব সকালে ওঠে মণিমালা। আর সকালে উঠেই খবরের কাগজটি তার সব চেয়ে আগে দেখা চাই এবং সকালের মধ্যেই শেষ করে ফেলা চাই মোটামুটি। তার আগে সে কাজে হাত দেয় না। যদি বা দেয়, ফাঁকে ফাঁকে আবার একটু একটু চোখ বুলিয়ে নেয় কাগজে।

বলি, 'কাগজ তো আর পালাচ্ছে না, দুপুরে পড়ো।'

মণিমালা বলে, 'আহাহা, দুপুরে আর কোন কাজ নেই বুঝি। ভয় নেই, কাগজ পড়ি বলে কি কোন দিন লেট হয়েছে অফিসে?'

তা অবশ্য হই নি। কাজকর্মে একটু বেশি রকম চটপটেই আছে মণিমালা। আমার মত মন্থর হলে আর উপায় ছিল না।

সুবিমলের সঙ্গে সেই আলোচনার পর মণিমালার সংবাদ-প্রীতিটা যেন আমার আরো একটু বেশি করে চোখে পড়ল। ইংরেজী বাংলা খান-দুই করে খবরের কাগজ রাখে মণিমালা। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে দেখি সারা দুপুর প্রায় তাই নিয়েই পড়ে থাকে। কেবল খবরের কাগজই নয়, তিনচারখানা মাসিক সাপ্তাহিকও নেয় হকারের কাছ থেকে। একটু যেন চোখে লাগে। এই খাতে এত ব্যয়টা আমার বাজেটে কুলোয় না।

একদিন বললুম, 'আচ্ছা, সাময়িক কাগজগুলির জন্য মাসে আমাদের কত ব্যয় হয় বলো দেখি। টাকা পনের বোধ হয়?'

মণিমালা বলল, 'পনের কেন, পাঁচশ!'

'মাসিক সাপ্তাহিক তো কম নাও না।'

মণিমালা বলল, 'সবগুলিই পুরো দামে নিই নাকি? তুমি বুঝি তাই ভেবেছ?'

'তবে? হকার বুঝি তোমাকে বিনা দামে সব দিয়ে যায়?' আমি আড়চোখে একটু তাকিয়ে দেখলাম মণিমালার মুখ। কিন্তু কোন রকম রঙ-বদল ধরতে পারলাম না। না হল ফ্যাকাসে না হল লাল। গৌরবর্ণ গৌরবর্ণই রইল।

মণিমালা বলল, 'বিনা দামে দেবে কেন? করি কি জানো?

পত্রিকা পিছু দু পয়সা চার পয়সা করে দিই। সপ্তাহখানেক রাখি। পড়া হয়ে গেলে সব আবার ফেরত দিই হকারকে, ফলে দুজনেরই লাভ হয়। তারও, আমারও।'

বললুম, 'পদ্ধতিটা মন্দ নয়। পয়সা বাঁচে। কিন্তু মান যেন ততখানি বাঁচে না। ভাল কথা, তোমার জানাশোনা আছে নাকি এ হকারের সঙ্গে ?'

'তাতো আছেই। জানাশোনা না থাকলে এসব চলবে কেন ? বিশ্বাস করবে কেন আমাকে ? যদি একদিন জানলা বন্ধ করে তার কাগজগুলো সব মেরে দিই !' হেসে উঠল মণিমালা।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালুম তার দিকে, তারপর বললুম, 'আচ্ছা, আমাদের পুরোনো সেই হকারটিই তো আছে না ?'

মণিমালা বলল, 'বাঃ, সে দেখি কবে ছেড়ে গেছে ! সংসারের কোন খোঁজ খবর তো আর রাখবে না তুমি !'

হেসে বললুম, 'সব খবর কি রাখতে দাও যে রাখব, না সব খবর রাখা ভাল ?'

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলাম, 'আচ্ছা মণি, শুনলুম একজন হকারকে নিয়ে তোমাদের বাসায় কি একটা গোলমাল হয়েছিল, ব্যাপারটা কি বলো তো ?'

লক্ষ্য করলুম, রঙ তেমন না বদলালেও এবার যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল মণিমালার মুখ। বলল, 'এতদিন পরে সে কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?'

বললুম, 'যার কাছে শুনেছি সে অবশ্য তেমন রিলায়েবল নয়। সব চেয়ে বেশি রিলায়েবল মানুষটির কাছেই তাই কথাটা জিজ্ঞেস

করছি কিন্তু ভাবছি জিজ্ঞাসা করবার আগেই কথাটি তুমি বল নি কেন?'

মণিমালা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'বলবার মত মনে হয় নি বলেই বলি নি। কিন্তু জানি না কথাটা কি ভাবে তোমার কানে গেছে। এখন মনে হচ্ছে বলাই ভালো ছিল।'

একটু হেসে বললুম, 'বলবার সময় যে এখনো বয়ে গেছে তা ভাবছ কেন?'

'না তা ভাবি নি, শোন।'

ছুটির দিনের বিকেল। ভাইবোনের দল গলিতে খেলায় ব্যস্ত। জানলার কাছে ইজিচেয়ারটা টেনে বসলুম। সূর্যাস্তের আলো পড়েছে মণিমালার মুখে।

কিন্তু ঘটা যতটুকু ছিল, মণিমালার মুখে ঘটনা তার চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত রূপ নিল।

বিয়ের আগে একটি হকার ভোরবেলায় কাগজ দিয়ে যেত মণিমালাদের। মণিমালার বাবা মা ভাই বোন সকলেই লেট-রাইজার। আমার মতই দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন। মণি-মালারও আগে তাই অভ্যাস ছিল। কিন্তু তার বাবা যেদিন থেকে কাগজ নেওয়া শুরু করলেন, তার দিনকয়েক পর থেকেই একটু সকাল সকাল উঠতে হল। কাগজ হারিয়ে যায়, হকার কোথায় কার জানলায় ফেলে দিয়ে যায় কাগজ ঠিক পাওয়া যায় না। কোন কোন দিন হয়তো অন্য কোন ভাড়াটের হাতে গিয়ে পড়ে, তারপর বেলা নটা দশটা পর্যন্ত তাদের হাতে হাতেই ঘুরতে থাকে। কোন দিন হয়তো কাগজটা ফেরৎ পাওয়া যায় না।

এই নিয়ে পাশের ঘরের ভাড়াটের সঙ্গে একটু গোলমালও একদিন হয়ে গেল। মণির বাবা রাগ করে বললেন, 'দু আনা করে কাগজটার দাম। এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যায়, কারো গায়েই লাগে না সংসারে! পয়সা কি মাগনা আসে নাকি?'

বাড়ির মধ্যে তবু একটু সকালে ওঠে মণি। তার ওপর ভার পড়ল কাগজটা হাতে হাতে নেওয়ার। মণির বাবা হকারকেও একদিন ডেকে ধমকে দিলেন, যার তার হাতে যেখানে সেখানে কাগজ ফেলে দিয়ে গেলে, কাগজ যদি খোয়া যায়, মাসিক হিসাব থেকে দাম তিনি কেটে রাখবেন। কাগজ যেন স্বয়ং মণির হাতেই পৌঁছে দেয় হকার, ভুলে কিংবা ইচ্ছা করে যেন অন্য কারো হাতে না দিয়ে যায়।

বাপের বকুনি খেয়ে আরও সকালে উঠতে শুরু করল মণি। কিন্তু যত ভোরে ওঠে তার চেয়েও বেশি ভোরে আসতে থাকে হকার। বোধ হয় মণির বাবার বকাবকিতে তার মনেও এক ধরনের জেদ জন্মে থাকবে। ইচ্ছা হয়ে থাকবে মণিকে আর তার বাবাকে জব্দ করবার। এমনি করে মণি আর তাদের সেই হকারের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা চলতে লাগল কে কত ভোরে উঠতে পারে।

বললুম, 'অভ্যাসটা কিন্তু ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। বেলা করে ওঠবার সেই অভ্যাস থাকলে আমার সাড়ে নটার অফিসের ভাত আর কোন দিন নামত না।'

মণি ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তার মানে?'

'মানে আবার কি! আচ্ছা তোমাদের সেই হকারের নাম কি ছিল? নামটা নিশ্চয়ই এতদিনে ভুলে যাও নি।'

মণি চটে উঠে বলল, 'না ভুলব কেন? নাম পরিতোষ। বয়স তোমার চেয়ে কম, রূপ তোমার চেয়ে বেশি। এবার হল তো? যতই উদারতার ভান করো না, পুরুষের মত এমন ছোট জাত আর দুটি নেই। ব্যাপারটা কি শুনবে?'

ব্যাপারটা শুনলুম। কাগজ নিতে নিতে মণির একদিন আলাপ হয়ে গেল পরিতোষের সঙ্গে! কাগজ দিতে কামাই করার প্রসঙ্গেই কথা হয়েছিল। কৈফিয়ৎ হিসাবে পরিতোষ জবাব দিয়েছিল, 'ছোট বোনটি অনেকদিন ধরে ভুগছিল কালাজ্বরে, কাল মারা গেছে।'

মণি জিজ্ঞেস করেছিল আর কে কে আছে পরিতোষের বাড়িতে। কি করে পরিতোষ, কেমন ক'রে দিন চলে বাপ মা আর অতগুলি ভাইবোন নিয়ে। কেবল কি হকারিতেই হয়।

তাই কি আর হয়। পরিতোষের বাবার চায়ের দোকান আছে বেলেঘাটায়, বাসার কাছেই। মেজো ভাইও সেই দোকানে কাজ করে। ছেলেটার পড়াশুনো আর কিন্তু হল না। পড়িয়ে লাভও নেই, ভারি মাথা মোটা। সেজোটি অবশ্য পড়ছে ফোর্থক্লাসে। হকারি ছাড়াও একটি অফিসে কাজ করে পরিতোষ। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্যাকিং ডিপার্টমেণ্টে। কতদূর পড়াশুনো করেছে, কত মাইনে পায়, ইচ্ছা থাকলেও মণি কোন দিন সে সব কথা জিজ্ঞেস করতে পারে নি।

হেসে বললাম, 'কেবল নামটাই বুঝি জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলে? কি ভাগ্য, হকারের নাম হরিচরণ না হয়ে হল পরিতোষ!'

মণি জবাব দিল, 'বেশ তো হরিচরণ ভেবে তুমি যদি খুশী হও তা হলে তাই।'

না, নাম জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার হয় নি। নামধামের প্রশ্ন উঠল শেষ দিন। মাস পাঁচছয় পরে যে দিন পাশের বাড়ির ভুবনবাবুরা এসে নালিশ করলেন মণির বাবার কাছে। মণিদের জানলায় নাকি বৃন্দাবনলীলা চলছে। বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বললেন ভুবনবাবু আর তাঁর বউ। গলির পুবে মণিদের বাড়ির উল্টো মুখে তাঁদের বাড়ি। মণি আর তার হকারের কাণ্ড-কারখানা সবই নাকি তাঁদের চোখে পড়েছে। যতদিন চোখে সয়, ততদিন তাঁরা কিছু বলেন নি। এখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। ভদ্র পাড়ায় এ রকম যদি প্রশ্রয় চলে তা হলেই হয়েছে। বাড়ির মেয়েরা এর পর থেকে ধোপা-নাপিত-মেথরের সঙ্গে প্রেমে পড়তে শুরু করবে।

বললুম, 'চোখে তাঁদের অসহ্য হয়েছিল কেন?'

'তাঁরা নাকি খবরের কাগজ নেওয়ার সময় ফুল, রুমাল আর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান দেখতে পেয়েছিলেন। এমন কি কাগজ দেওয়ার ছলে হাতে হাত পর্যন্ত ধরা থাকতে দেখেছিলেন তাঁরা।'

বললুম, 'তাঁরা কি ভুল দেখেছিলেন?'

মণি বলল, 'সে কথা তাঁদের কাছেই ভালো করে জেনে এসো গিয়ে, ২৬ নম্বর ডিক্‌সন লেন তাঁদের ঠিকানা। আমাদের বাড়ির ঠিক অপজিটে।'

বললুম, 'নম্বরটি ডায়রীতে নোট করে নেব। তারপর কি হল বল।'

'কি আবার হবে। হৈ চৈ হল খানিকটা। পরদিন ভোরে উঠে মণির বাবা পরিতোষকে কাগজ দিতে বারণ করে দিলেন।

প্রতিবেশী ভুবনবাবু আর একটু উদ্যোগী হয়ে খবরটা পৌঁছে দিলেন পাড়ার ক্লাবে। তারা মারধোর করবার ভয় দেখাল। কেউ কেউ রুখে এগিয়েও গেল। প্রবীণ দু চার জন যাঁরা ছিলেন তাঁরা থামিয়ে দিলেন। পাড়ায় যাঁরা কাগজ নিতেন পরিতোষের কাছ থেকে তাঁরা প্রায় সকলেই কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। বয়স্থা বউ-ঝি যাদের ঘরে নেই তাঁরাই দু এক জন কেবল গ্রাহক রইলেন পরিতোষের, কিন্তু পরিতোষ বেশি দিন থাকতে পারল না, কেন না কাগজ নেওয়ার সময় রোজ তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন, কি হয়েছিল ব্যাপারটা, কতদূর গড়িয়েছিল।

বললুম, 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে গেল বেচারার।'

'তা তো হলই! লঘু পাপে নয়, বিনা পাপে।'

বললুম, 'কিন্তু তুমি করলে কি? দণ্ডহ্রাসের কোন চেষ্টাই তুমি করলে না।'

মণি বলল, 'নিশ্চয়ই করেছি। সেই পরিতোষই তো কাগজ দিচ্ছে আমাদের। এ পাড়ায় আরও অনেক খদ্দেব ওর জুটিয়ে দিয়েছি।'

একটু স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। বাঙালী মেয়ের পক্ষে একটু যেন বেশি বেপরোয়া মণিমালা। এত সাহস এত স্বাধীনতা সে পেলো কোত্থেকে? তাছাড়া পরিতোষের কাছ থেকে কাগজ নেওয়ার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতে ক্ষতি ছিল কি।

কথাটা বললুম মণিকে। মণিমালা কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমার আত্মসম্মানে বেধেছে। তাই করি নি।

এত সব শোনার পর ওকে রাখতে তোমার যদি আত্মসম্মানে বাধে তুমি ছাড়িয়ে দিতে পারো।'

মণিমালা আরক্ত মুখে দাঁড়াল। আমি হাত টেনে ধরলুম মণিমালার, বললুম, 'তোমার সম্মান আর আমার সম্মান কি আলাদা?'

মণিমালা এবার শান্ত নরম সুরে বলল, 'তাহ'লে ওকে ছাড়িয়েই দিই।'

বললুম, 'পাগল নাকি! বেশ তো কাগজ দিচ্ছে নিয়ম মত। কোন্ দোষে ছাড়াবে?'

পরিতোষ রয়ে গেল। মশারির ভিতর থেকে জানলা দিয়ে একদিন দেখলামও তাকে। বাইশ তেইশ বছর বয়স। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। ফর্সা গায়ের রং, টানা টানা নাক চোখ, খাকির হাফ প্যাণ্ট, টুইলের হাফসার্টে অদ্ভুত মানিয়েছে তাকে।

তা মানাক। তবু তো হকার। আর হকার মানে কাগজের ফিরিওয়ালা।

কিন্তু এই ফিরিওয়ালার বেশে মাঝে মাঝে যেন দাঁড়াতে ইচ্ছা করে বছর দুয়েক আগেকার ড্রিক্সন লেনের গলিতে মণিমালাদের সেই পূবমুখী জানলায়।

সাইকেলের মৃদু ঘণ্টায় মণিমালার ঘুম ভেঙ্গেছে, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙে নি। কেবল ভোরের আলোর রং লেগেছে সেই স্বপ্নে। কুমারীর প্রথম স্বপ্নের রং মেখে দাঁড়িয়েছে এক ফিরিওয়ালা। কতদূর সে পড়াশুনো করেছে, কি তার কুলশীল, কত তার রোজগার জেনে দরকার কি? সে তো তা জানাবার জন্য আসে নি, সে খবর

নিয়ে এসেছে ছুনিয়ার। এনে পৌঁছে দিয়েছে আর একজনের কাছে। কি দরকার ফুল আর রুমাল বিনিময়ে, কোন ভদ্র ঘরের কুমারী তা করে না। কিন্তু তার কাছ থেকে যে শুভ্র সুন্দর কাগজখানি সে হাত পেতে নেয়, কাগজের যে মৃদু উত্তাপ সে হাতে অনুভব করে সে কি কেবল প্রেস থেকে সদ্য বেরুনো কাগজেরই উত্তাপ! জানলার বাইরে, গোটা কয়েক লোহার শিকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে একবার যেন দেখতে ইচ্ছা করে সে দিনের সেই মণিমালাকে। কিন্তু কি করে দেখব? সেদিন ছু বছর আগে শেষ হয়েছে। তা ছাড়া আমি সাইকেলে উঠতে জানি না, প্যান্ট আর হাফসার্ট আমার ছু চোখের বিষ, সেই সঙ্গে সংবাদপত্র। ছুনিয়ার সব তথ্য ডিঙিয়ে আমি একেবারে তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছতে চাই।

কিন্তু খবর ভারি ভালবাসে মণিমালা, ভারি ভালবাসে খবরের কাগজ। এক এক দিন ছুপুরে হঠাৎ অফিস ছুটি হয়ে গেলে বাসায় পা টিপে টিপে এসে দেখি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে মণিমালা কাগজ পড়ছে। খবরের কাগজের বড় বড় পাতায় অনেকখানি ঢেকে গেছে শরীর। ভিজে চুলের গোছা পড়েছে মেঝের ওপর। কাগজের ওপর দেখা যাচ্ছে তার চোখ। কালো টানা টানা ভারি সুন্দর ছুটি চোখ মণিমালার। এই চোখে কেবল রাজ্যের বাজে খবর সে কেন দিন রাত পড়ে? এত ভালো ভালো কবিতার বই রয়েছে র‍্যাকে, কেন ছু-একখানা সে তুলে নেয় না তার থেকে? না কি কাগজের খবরই তার কাছে কাব্যের লালিত্য পেয়েছে, কাব্যের মর্যাদা আর মাধুর্য পেয়েছে অপরূপ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের? এ কবি কে? কে তাকে এত কাগজ পড়তে শেখাল?

সত্যিই কি কাগজ ভালবাসে মণিমালা না কাগজের কবিকে? পরিতোষের কাছ থেকে কি কেবল ভোরে ওঠার সদ্‌গুণই শিখে নিয়েছে, শেখে নি অল্প পয়সায় মাসিক সাপ্তাহিক পড়বার উপায় যাতে দু জনেরই লাভ হয়? শেষ পর্যন্ত কি সেই দু পয়সা চার পয়সা পরিতোষকে হাত তুলে দিতে পেরেছে মণিমালা, না কি পরিতোষই নিতে পেরেছে হাত পেতে? বিনা পয়সার মাসিক সাপ্তাহিকের যোগান দিয়েও কি শেষ দিকে দু জনের লাভ হয় নি? কিংবা পরিতোষের হকারিটা কি সত্যিই পেশা, না নেশা?

অবশ্য এ সব কল্পনাকে আমি মোটেই আমল দিই নে। হাজার হলেও আমি সুবিমল গুপ্ত নয়, অসিত সেন। পুরো দু বছর ধরে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছি আমি মণিমালার। নিবিড়তম সান্নিধ্যে এসেছি পরস্পরের। মণিমালার রুচি বুদ্ধি হৃদয়ের কথা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে? পরিতোষের সঙ্গে যদি কোন সম্পর্ক তার গড়েই উঠে থাকে তা নিশ্চয়ই হৃদয়ঘটিত নয়। বড় জোর সহৃদয় সহানুভূতির।

তবু ভোর হতে না হতেই ঘুম ভাঙে মণিমালার। আর ঘুম ভাঙলে তাকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। একটু আগে কি একটু পরে শোনা যায় সাইকেলের ঠুন ঠুন শব্দ। আমার বাসায় কাগজ হারাবার ভয় নেই। তবু কাগজখানা হাতে হাতে নিতে কি যে ছেলেমানুষী সখ মণিমালার, সে-ই জানে। হাত থেকে কেবল কাগজ নেওয়া নয়, জানলার কাছে মণিমালা আর হকারের মৃদু আলাপ আমার মাঝে মাঝে এখনো এক এক দিন কানে আসে। খুব কান পাতলে শোনা যায়, কোন সাপ্তাহিকের স্পেশাল ইস্যুটা

কবে বেরুবে, মাস পেরিয়ে গেলেও কোন মাসিক কাগজের নতুন সংখ্যা এখনো কেন দেরি হচ্ছে বেরুতে, মৃদু কণ্ঠে এই সব প্রশ্ন আর তার জবাব।

নিতান্তই সাধারণ আর দরকারী দুএকটি কথা, যে ধরনের আলাপ ধোপার সঙ্গে, গয়লার সঙ্গে কয়লাওয়ালার সঙ্গে করে মণিমালা, হকার পরিতোষের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনাও তার চেয়ে ভিন্নশ্রেণীতে ফেলা যায় না। কেবল কাপড় কি কয়লা না হয়ে আলোচনাটি খবরের কাগজ সংক্রান্ত হয় এই যা তফাৎ। তবু এই কাগজ নেওয়া কাগজ পাওয়ার মধ্যে যেন বেশ একটু উল্লাস অনুভব করে মণিমালা। হকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় এক আধটুকু কথাবার্তার বিনিময়ে যেন অদ্ভুত এক অন্তরঙ্গতার সুর তার গলায় ফুটে উঠতে শুনি। অত্যন্ত অশোভন অত্যন্ত অবাঞ্ছিত, তবু মনের মধ্যে খুঁৎখুঁতিটা লেগেই থাকে, অথচ এই খুঁৎখুঁতিটাকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না, স্বীকৃতি দিতেও লজ্জা পাই।

একদিন বললুম, 'মণি, পরিতোষের সঙ্গে যদি তোমার আলাপ-আলোচনার কিছু থাকেই, তাকে বাড়ির ভিতরে ডেকে আনলেই তো পারো।'

মণি মুখ টিপে একটু হাসল, 'বল কি একেবারে বাড়ির ভিতরে! বাইরে রেখেছি তাতেই তোমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, আরো ভিতরে ডেকে আনলে যে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসবে।'

পরিতোষকে নিয়ে এর আগেও আমাদের মধ্যে একআধটু ঠাট্টা তামাশা হয়েছে। মণি অত্যন্ত অসংকোচে এসব তামাশায় যোগ দেয় বলে খানিকটা নিশ্চিন্তই বরং হই। সত্যিই যদি কিছু থাকত

মণিমালার মনে তা হলে কি ও অমন সহজ হতে পারত, এই নিয়ে হাসি তামাশা করতে পারত আমার সঙ্গে ?

তবু খানিকটা গম্ভীর ভঙ্গিতে বললুম, 'না না ঠাট্টা নয় জানলায় দাঁড়িয়ে কথা বল, কারো চোখে পড়লে কেউ কিছু মনে করতে পারে।'

মণিমালা বলল, 'মনে আবার করবে কি। হকারের কাছ থেকে কাগজ নেব, কাগজের দাম দেব, দেরি করবার জন্য কৈফিয়ৎ নেব তার জন্য এখনো যদি কেউ কিছু মনে করে আর সেই মনের কথা মুখে বলতে পারে, তুমি আছ কিসের জন্য ? কেউ কিছু বলুক তাই তো আমি চাই সেইজন্যই তো অত সব কাণ্ডের পরও ফের আমি ওকে রেখেছি। বেশ তুমি যদি বলো ওকে কাল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে। একটা অজুহাতের নিশ্চয়ই অভাব হবে না।'

বললুম, 'না, আমি ওকে ছাড়িয়ে দিতে তো বলি নে।'

মণিমালা মধুর ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'তা অবশ্য বল না। বরং ঘরে ডেকে এনে চা জল খাবার খাইয়ে গল্পটল্প করতেই বল। কিন্তু তা কি করে সম্ভব বল তো। অত সময় ওরও নেই, আমারও নেই। যাই বলো, তুমি একটি আচ্ছা মানুষ যা হোক।'

পরিতোষকে ছাড়ানো হয় না। দরকারী কথাবার্তার আদান-প্রদান সংখ্যায় এবং পরিমাণে হয়তো কিছু কমে কিন্তু পরিমাণই তো সব নয়। ভেবেছিলুম আমার মনোভাব টের পেয়ে মণিমালা হয় তো কোন একটা অজুহাতে নিজেই ওকে একদিন ছাড়িয়ে দেবে, কিন্তু কেবল রসিকতা আর ঠাট্টা তামাশাই করে মণিমালা, ছাড়াবার কথা বোধ হয় ওর মনেও ওঠে না। আমি নিজেই অবশ্য

পরিতোষকে ছাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু কেন ছাড়াচ্ছি তা অনুমান করে পরিতোষ নিশ্চয়ই মুখ মুচকে হাসবে, ঠোঁট টিপে হাসবে মণিমালা। কেন না নিয়মিত কাগজ দেওয়া ব্যাপারে পরিতোষের সত্যিই কোন গাফিলতি নেই। মাঝে মাঝে খানিকটা ঔৎসুক্য আর কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও পরিতোষের সঙ্গে আমি এ পর্যন্ত আলাপ করি নি। ইচ্ছা করেই করি নি। কেন না যে সব ব্যাপার ঘটে গেছে আর তা ঘটা সত্ত্বেও পরিতোষ যখন আজও আমাদের কাগজ দিচ্ছে তখন ওর সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়া মানেই ওকে সাধারণ হকারের চেয়ে উচ্চপদস্থ এবং নিজেকে অপদস্থ করা।

এই হকার-প্রীতি আর কাগজ পড়বার বাতিক ছাড়া মণিমালার আর কোন ত্রুটি পাই নি। ঘরকন্নায় যেমন দক্ষ, সেবা পরিচর্যায় তেমনি সুনিপুণ। স্বল্পবিত্ত সংসারে মণিমালা আদর্শ গৃহিনী। দারিদ্র্য আর আর্থিক অনটনকে মণিমালা অদ্ভুতভাবে আড়ালে রাখতে পারে। এই নিয়ে স্তুতিবাচক কিছু বললে মণিমালা জবাব দেয়, 'বড়লোক বাপ মার ঘর থেকে তো আসি নি। গরীবের ঘরেই মানুষ হয়েছি, একুশ বছর ধরে শিক্ষানবিসি করেছি মার কাছে। এইটুকু না পারলে পারব কি। জানো একবার ছ মাসের পুরোনো কাগজ বিক্রির টাকা জমিয়ে বাবাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম। একখানা কাগজও হারাতে দিই নি পোড়াতে দিই নি নষ্ট হতে দিই নি। বাড়ির সবাই ঠাট্টা করত কাগজ তো নয়, মণির দামী দামী সব শাড়ি।'

কেমন যেন একটু খোঁচা লাগে মনের মধ্যে। সত্যিই কি তাই, কাগজের প্রসঙ্গে মণিমালা এমন উল্লসিত এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কেন। খবরের কাগজ কি তার কাছে শুধুই খবরের কাগজ? বাড়ির লোকের ঠাট্টা কি কেবল ঠাট্টা।

এদিকে স্বজন বন্ধুদের মহলে মণিমালার খ্যাতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা বলে আমার স্ত্রীভাগ্যে তারা নাকি ঈর্ষান্বিত। এমন সুস্বাদু চা নাকি আর কারো হাতেই হয় না, এমন সুহাসিনী সুভাষিণী আলাপচতুরা বন্ধুপত্নী আমার বন্ধুরা নাকি ইতিপূর্বে আর দেখে নি। বন্ধুদের মধ্যে জন দুয়েক আছেন সাংবাদিক। তাঁরা আরও অতিরিক্ত কিছু আবিষ্কার করলেন। একদিন তাঁদের মুখ থেকেই আমি জানতে পারলাম দেশবিদেশের সংবাদনীতি তথা রাজনীতি সম্বন্ধে আমি যে পরিমাণ অজ্ঞ, মণিমালা ঠিক সেই পরিমাণ ওয়াকিবহাল। নিরুপম বলল, 'সত্যি এমন অদ্ভুত নিউজসেন্‌স্ আমাদের নিউজ এডিটরেরও নেই।'

মণিমালা আরক্ত মুখে বলল, 'নিউজসেন্‌স্ না আরও কিছু। খবরের কাগজ ভালো লাগে তাই পড়ি।'

নিরুপম মাথা নাড়ল, 'উঁহু, কেবল ভালো লাগা নয়, খবরের কাগজ সম্বন্ধে অদ্ভুত প্যাশন আছে আপনার। আরো তো বান্ধবী আছেন, খবরটা তাঁদের কাছে কেবল কাগজের ব্যাপার। সংবাদ নিয়ে কিছু একটা আলোচনা করতে গেলে আমাদের এই অসিতের মতই বিসংবাদ বাধানো। সংবাদ মানে তাঁদের কাছে কেবল সিনেমা-সংবাদ। আপনিই শুধু ব্যতিক্রম। কিন্তু এই অসাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে আপনার বনে কি করে?'

কি করে যে বনে সে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন না করে মণিমালা হঠাৎ তার অতীত জীবনে ফিরে গেল, 'জানেন আগে আগে আমিও খবরের কাগজ দু চোখে দেখতে পারতুম না। নিতান্ত বাধ্য হয়ে কাগজ পড়তে শিখেছি।'

'বাধ্য হয়ে?'

'প্রায় তাই! কাগজ না পড়লে কাগজ হারিয়ে যায়, কে কোথায় নিয়ে যায় খেয়াল থাকে না, আর হারিয়ে গেলে বকুনি খেতে হয় বাবার।'

নিরুপম বলল, 'আপনার বাবাকে বহু ধন্যবাদ। বকে বকে মেয়েকে একটি সদ্‌গুণ অভ্যাস করিয়েছেন।'

মণিমালা বলল, 'বাবা ছাড়া আরো একজনকে অবশ্য ধন্যবাদ দিতে হয় এর জন্য। অত ভোরে অত গরম কাগজ হাতে করে না এনে দিলে কেবল বকুনির ভয়ে কাগজ পড়াটা কিছুতেই রপ্ত হত না আমার।'

মণিমালা আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকাল। হাসির আভাস লেগে আছে তার ঠোঁটে।

নিরুপম বলল, 'তা'হলে সাংবাদিক হবার মূলে আপনার কেবল ভয়ই নয়, ভালবাসাও ছিল বলুন।'

মণিমালা বলল, 'কি যে যা তা বলেন।' এবার যেন সত্যিই মণির মুখ বেশ একটু আরক্ত দেখাল। এই রক্তিমতা কি কেবল নিরুপমের মুখে ভালবাসা শব্দটির উল্লেখ শোনার জন্য না আরো কোন গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে এর মধ্যে? কেন স্পষ্ট করে জানাল না মণিমালা যে যার কাছ থেকে গরম খবরের কাগজ সে পেত তার

কাছ থেকে সবাই কাগজ পায়, কেন বলল না সে একটা সাধারণ হকার মাত্র, তার সঙ্গে ভালোবাসার কোন কথাই উঠতে পারে না। মণিমালার এ ধরণের তামাশা আর হেঁয়ালি ক্রমেই শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ওকে একবার নিষেধ করে দিতে হবে।

ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটল। নিরুপমের দূর সম্পর্কের কি এক আত্মীয়া মেয়েদের একটি মাসিক পত্রিকা বের করছেন। নিরুপম প্রস্তাব করল তাতে সংবাদ-সাময়িকী লিখবে মণিমালা।

মণি বলল, 'আমি পারব কেন?'

নিরুপম উৎসাহ দিয়ে বলল, 'খুব পারবেন। প্রথম প্রথম না হয় আরো কয়েকটি সাময়িক পত্র একটু দেখেশুনে নেবেন। স্কুল-কলেজে প্রবন্ধ-টবন্ধ তো লিখেছেন। তার চেয়ে মোটেই কঠিন নয়। একটু অভ্যাস করলেই হয়ে যাবে। তাছাড়া মেয়েদের কাগজে মেয়েরা লিখলেন সেই তো ভালো। সেই প্রমীলা রাজ্যে আমি কেন অনধিকার প্রবেশ করতে যাব?'

বুঝতে পারলাম লিখবার জন্য নিরুপমের কাছেই অনুরোধটা এসেছিল। নিরুপম সেটা হস্তান্তরিত করতে চাচ্ছে।

আরো একটু ওজর আপত্তির পর মণিমালা রাজী হয়ে গেল। আর কেবল রাজী হওয়াই নয়, তার সেই সাময়িক প্রসঙ্গের উপাদান সংগ্রহের জন্য পরিশ্রমের যেন আর সীমা রইল না। এ কাগজ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি, ও কাগজ থেকে খানিকটা ভাষান্তর, সেই সঙ্গে নিজস্ব ভাষ্য কিছু যোগ করে জিনিসটা মোটামুটি একরকম দাঁড়াল। মণিমালার নাম সুদ্ধ লেখা ছাপা হল মাসিক পত্রে। একাধিকবার সেই মুদ্রিত রচনা উলটে পালটে

দেখল মণিমালা। তার মনের কথাকে আমি ভাষায় রূপ-দিয়ে বললুম্‌ ‘ছাপার অক্ষরে তোমার নামটা যেমন মানায় তেমন আর কারো মানায় না।’

মণিমালা জবাব দিল, ‘তুমি জন্মহিংসুক।’

খবরের কাগজ এতদিন কেবল ছিল পড়বার বস্তু, এবার থেকে তার আরো প্রয়োজন বাড়ল। সংবাদপত্র মণিমালার রচনার উপাদান, তার আত্মপ্রকাশের অবলম্বন। কেবল মেয়েদের কাগজেই নয়, দু-একখানা পুরুষ-পরিচালিত পত্রিকায়ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মণিমালার প্রবন্ধ ছাপা হল। আমার সংবাদ বোধ সম্বন্ধে যত অশ্রদ্ধাই থাকুক প্রবন্ধগুলি ছাপতে দেওয়ার আগে মণিমালা আমাকে দেখিয়ে নেয় এবং বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কিছু কিছু কলম চালালে আপত্তি করে না।

একখানা কাগজও নষ্ট হওয়ার জো নেই। প্রত্যেকটি কাগজ আলাদা আলাদা ফাইল করে রাখে মণিমালা। দরকারী জায়গা-গুলি লাল পেনসিলে দাগিয়ে রাখে। যাতে লেখার সময় কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়। পাঁচ দশ টাকা মাঝে মাঝে পারিশ্রমিকও পায় মণিমালা। তা দিয়ে ফের আবার কাগজ কেনে।

বেশ দিন কাটছে। স্ত্রীর খাতিরে এবং স্ত্রীর প্রভাবে আমিও একটু একটু সাংবাদিক হয়ে উঠছি। হঠাৎ আজ ভোরে জানলার ধারে কি একটু শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মণিমালা আর পরিতোষের আলাপ চলেছে। প্রায় রোজ অন্তত মাঝে মাঝে এরকম আলাপ ওদের চলে।

আগে আগে কান পাততুম আজকাল আর পাতি না। কান পাতলেই কি সব কথা বোঝা যায়।

কিন্তু আজ একটু বিরক্তই হলাম। এত উঁচু গলায় কি বলছে মণিমালা। কিছু কি লজ্জাসম্ভ্রম নেই? লোকে দেখলে কি মনে করবে?

ভাবলুম এবার সত্যিই মণিমালাকে সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। সাবধান না করে দিলে আর চলে না। প্রতিবেশীর তো এখানেও অভাব নেই। কথা একটা তুলে দিলেই হল।

পা টিপে টিপে দাঁড়ালাম গিয়ে মণিমালার পিছনে। দেখলুম দু হাতে জানলার দুটো শিক ধরে মণিমালা বাইরের দিকে বেশ একটু ঝুঁকে পড়েছে। যেন শিকের বাধা আর মানতে চাইছে না সে। আর সাইকেলের আগায় কাগজের স্তূপ নিয়ে অপলক চোখে দাঁড়িয়ে আছে পরিতোষ। নিজের উপস্থিতি আমি ওদের টের পেতে দিলুম না, তার চেয়ে ওদের আলাপের ধরনটা শোনা যাক। অনেকদিন শুনি না।

পরিতোষ কি বলতে যাচ্ছিল, মণিমালা হঠাৎ যেন ধমক দিয়ে উঠল। 'চুপ, আমি আর তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।'

পরিতোষ থতমত খেয়ে বলল, 'কিন্তু কাগজটি সত্যিই ভদ্রলোক প্রায় জোর করে কেড়ে নিয়ে গেলেন। এদিকে ইংরেজী আর কেউ আনে না কিনা। আমি ভাবলুম আপনি তো ইংরেজী বাংলা আরো অনেকগুলি কাগজ রাখেন—'

মণিমালা চেঁচিয়ে বলল, 'তাই বলে আমার কাগজটা তুমি আর একজনকে বিলিয়ে দিয়ে আসবে? জোচ্চোর বেল্লিক কোথাকার।

আসলে এক পয়সা কি দু পয়সার লোভে আমার কাগজ তুমি তাকে বেচে দিয়ে এসেছ। দু সপ্তাহ আগে আর এক রবিবারও তুমি তাই করেছিলে। সে বারও তোমাকে আমি ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম মনে আছে?'

পরিতোষ বলল, 'আছে। কিন্তু আপনি যা ভেবেছেন তা নয়। দু পয়সা বেশি পাবার লোভে আমি তাঁকে কাগজ বেচি নি। তিনি ঠিক ন্যায্য দামই দিয়েছেন আমাকে। আমি বরং আর একখানা অমৃতবাজার আপনাকে কিনে দিয়ে যাচ্ছি একটু বাদে—'

মণিমালা বলল, 'ফের মিথ্যে কথা? তোমার অমৃতবাজার দিয়েও দরকার নেই, আনন্দবাজার দিয়েও দরকার নেই। কাগজ আমি কাল থেকে অন্য কোন হকারের কাছ থেকে নেব। আচ্ছা বদমাইসি শুরু করেছ তুমি।'

নেপথ্য থেকে এবার আমি এগিয়ে এলাম সামনে, বললুম, 'ছি, মণি, এসব কি বলছ তুমি। এতদিনের পুরোনো—'

মণিমালা বলল, 'পুরোনো হোক, নতুন হোক সব হকার সমান। তুমি চেন না ওদের। ফাঁকি দিতে পারলে ওরা আর ছাড়ে না। এক পয়সা দু পয়সার লোভে ওরা না করতে পারে এমন কিছু নেই। সে বার রবিবারের কাগজটা না পেয়ে এত অসুবিধা হয়েছে আমার। আজও তাই।'

হতভম্ব পরিতোষের দিকে ফিরে তাকাল মণিমালা, যাও, আর দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে। মাসের শেষে তোমার যা পাওনা গণ্ডা হিসাব করে নিয়ে যেয়ো। কাল থেকে কাগজ আর তোমাকে দিতে হবে না।'

হঠাৎ সশব্দে জানলা বন্ধ করে দিল মণিমালা। এই জানলা আমার মনের মধ্যে কতবার খুলেছে, বন্ধ হয়েছে কিন্তু এমন শব্দে নয়।

এবার আমি নিশ্চিন্ত। পরিতোষকে নিয়ে মণিমালা কেবল আমার সঙ্গে পরিহাসই করেছে। আমার সন্দিগ্ধতাকে বিদ্রূপ করেছে মাত্র। আসলে সামান্য কোন সম্পর্কই ওদের ভিতরে গড়ে ওঠে নি।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গড়ে উঠলেই যেন এর চেয়ে খুশী হতাম।

বন্যা।

গতবারের মত এবারও আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে বর্ষার জল দারুণ বাড়তে শুরু করল। মাঠ ময়দান আগেই তলিয়েছিল। এবার জল এগুতে এগুতে খালের মাঠের সবগুলি পৈঠা ছাড়িয়ে মল্লিকদের বাঁশ-বাগানের আম-বাগানের ভিতর দিয়ে আইনুদ্দিন শেখের উঠানের ওপর এসে দাঁড়াল। প্রথমে পায়ের পাতা ভেজে কি না ভেজে, তারপর জল গিরা পর্যন্ত উঠল। তাই দেখে আইনুদ্দিনের আট বছরের মেয়ে ময়নার ভারি ফুর্তি। সে ছোট ছোট দুখানি হাতে তালি দিতে দিতে বলল, "দেখছ নি বাজান, কি মজা।"

ময়নার দু হাতে দুটি লাল কাঁচের চুড়ি। শুক্রবার দিন ভাঙ্গার হাট থেকে কিনে এনেছে আইনুদ্দিন, মনোহারী দোকান থেকে এনেছে লাল ফিতে। তাই দিয়ে কাল বিকেলে ময়নার বিনুনী বেঁধে দিয়েছে জোবেদা। ভারি সতর্ক মেয়ে। পুরো একটি রাত গেছে। তবু সে বিনুনীর একটুও এদিক-ওদিক হয় নি। কিন্তু চুলগুলি কেমন যেন কটা কটা হয়েছে। ভাল তেল এনে দিতে হবে। মনে মনে ভাবল আইনুদ্দিন। জোবেদা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, তাকে ডেকে বলল, "মাইয়ার চুল যে রাঙ্গা রাঙ্গা হইয়া রইল, তা দেখছ নি?"

জোবেদা মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, "হবে না? নিজের চুল যেমন শেজারের কাঁটার মত খাড়া খাড়া, মাইয়ার চুলও সেইরকম হবে।"

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে জোবেদার। নাক চোখ কি গায়ের রঙের চেয়ে চুলের গর্বই তার বেশি। গোছে ভারী, লম্বায় বড়, রঙও তেমনি মিশমিশে। সেই চুলের সৌন্দর্য আরও বাড়াবার জন্যে হাট থেকে দামী গন্ধ-তেল এনে দেয় আইনুদ্দিন। কিন্তু তেল যেন দিনদিনই আগুন হচ্ছে।

আইনুদ্দিন বলল, "হ, সেইজন্যেই কিনা। আমার ঘরের ক্যাশবতী নিজের চুল লইয়াই অস্থির। মাইয়ার চুলের দিকে চাওয়ার সময় আছে নাকি তার।"

ময়না দাম্পত্যালাপে বাধা দিয়ে বলল, "বাজান, তুমি কেবল মার সাথেই কথা কও। আমার কথা মোটেই শোন না। আমি আর তোমার সাথে কথা কব না।"

আইনুদ্দিন হেসে মেয়েকে কাছে টেনে নিতে নিতে বলল, "কও কও, কী কথা কও।"

ময়না বলল, "পানি বাইয়া বাইয়া আমাগো উঠানে আইছে দেখছ নি বাজান। নাওয়ার জন্যে আর খালের ঘাটে যাইতে হবে না। গাঙ আসবে বাড়ির ওপর, আমরা সবাই মিলা ঝাপুর ঝুপুর কইরা নাব।"

শুধু মুখেই নয়, ময়না বাপের হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে সেই শুকনো বারান্দার ওপরে একবার উঠে একবার বসে স্নানের ভঙ্গি দেখাতে লাগল।

কিন্তু আইনুদ্দিন বিজ্ঞ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, "অত ফুর্তি করিস না রে ময়না, অত ফুর্তি করিস না। পানি যদি এইভাবে বাড়তেই থাকে, মাইনষের ঘর-দুয়ার এবারও ভাইসা যাবে। ধান

পান সব তলাবে। প্যাটে আর দানা পড়বে না, পানি 'খাইয়াই থাকতে হবে।"

জোবেদা ঝাঁট দিতে দিতে ঘর থেকে বারান্দায় নামল। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, "আইচ্ছা তুমি কেমন ধারার মানুষ কও দেখি। মাইনষের হাসি-খুশি দেখতে পার না। ওই এক্কু ফোটা মাইয়া, তারেও তুমি শাপ শাপান্ত করতেছ। ভাসে ত্থাশ ভাসবে। দশজনের যে গতি আমাগোও সেই গতি হবে। মরবার আগেই ভয়ে মইরা থাকব নাকি? ইন্দুরের গর্তে ঢোকব?"

কলকেটা হুঁকোর উপর দিয়ে আইনুদ্দিন তামাক টানতে টানতে মন্তব্য করল, "ইন্দুরের গর্ত আর নাই বিবি। সেখানে আগেই পানি ঢুইকা রইছে।"

জোবেদা রাগ করে বলল, "থাউক গিয়া।" তারপর মেয়েকে কাছে ডেকে নিয়ে মধুর প্রশ্রয়ের সুরে বলল, "আয় ময়না, আমার কাছে আয়। ঝাপুর ঝুপুর কইর‍্যা নাইবি। তারপর কী করবি।"

বাপকে ছেড়ে ময়না এবার মায়ের পিঠের কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল, হেসে বলল, "নাইয়া ধুইয়া খাব।"

"কী খাবি।"

"পিঁয়া ইজ-বটি আর কুমড়া দিয়া ইচা মাছের ছালোন।"

"তারপর?"

"উঠানে তো আমার গলাপানি হবে মা; বাজান ঘাটের নাও ঘরের থামের সাথে আইসা বান্দ্‌বে। খাইয়া লইয়া সেই নায়ে বইসা বইসা তুমি আর আমি আচাব, ফুত ফুত কইরা পানি ফেলব। না মা?"

বলতে বলতে ময়না খিল খিল করে হেসে উঠল।

জোবেদাও হেসে বলল, "শোন, তোমার মাইয়ার কথা শোন।"

বছর তিরিশেক বয়স হয়েছে আইনুদ্দিনের। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মুখে কালো চাপ দাড়ি। তাতে মানুষটিকে আরো বেশি গম্ভীর দেখায়। স্ত্রী আর মেয়ের হাসি দেখে আইনুদ্দিনও একটু হাসল। তারপর হুঁকোটা বেড়ায় ঝুলিয়ে রেখে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সবরকম কাজই জানে আইনুদ্দিন, সবরকমের কাজই করতে হয়। ক্ষেতে কখনো কিষাণ খাটে, কখনো কামলা ঘরামির কাজ করে, জুটে গেলে কাঠ-চেলা আর মাটি-কাটার কাজেও লেগে যায়।

কিন্তু বর্ষার বাড়াবাড়িকে ময়না আর তার মা যেভাবে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, পাড়াপড়শীরা তা জানাতে পারল না। এক আঙুল দু আঙুল করে রোজ জল বাড়তে লাগল! তারপর সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে জলে দেশ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উঠানে কোমর জল, ঘরেও হাঁটু অবধি ডুবে যায়। বর্ষা নয় বন্যা। গতবারের চেয়ে এবার দেড় গুণ বেশি। গাঁয়ের বাঁশের ঝাঁড় উজাড় হয়ে গেল। সবাই কাঁচা বাঁশ কেটে কেটে ঘরের মধ্যে মাচা বাঁধছে! বাড়ির উপর আর এক শরিক আছে আইনুদ্দিনের। ভাইপো মৈনুদ্দিন। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। বিধবা মা আছে, বউ আছে। অন্য সময় চাচা ভাইপোর মধ্যে বনিবনাও হয় না। বাড়ির সীমানা নিয়ে, বাঁশের পাতা, গাছের ডাল নিয়ে, ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। কিন্তু এখন দু জনে মিলে দুই ঘরেরই মাচা বাঁধল।

ময়না জল ভাঙে, আর ঘুরে ঘুরে বাপের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, "বাজান, কী কর।"

আইনুদ্দিন রূঢ় স্বরে জবাব দেয়, "আমার মাথা করি। সব্বনাশী, হাইসা হাইসা কারে তুই ডাইকা আনলি, সব যে ভাইসা গেল।"

মেয়েকে তাড়াতাড়ি কোলের কাছে টেনে নেয় জোবেদা, স্বামীর দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বলে, "ওয়ারে গাইলাও ক্যান, ওয়ার কী দোষ।"

মায়ের কোলে উঠেও ময়নার চোখ ছল ছল করে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে, "মা, এত পানি আইল কোত্থিকা।"

আঁচল দিয়ে মেয়ের চোখের জল মুছতে মুছতে জোবেদা বলে, "কান্দিস না ময়না, কান্দিস না।"

বাপ-মায়ের অনাদরে আর পেটের খিদেয় মেয়ের চোখে জল আসে, এইটুকুই জোবেদা জানে। কিন্তু বন্যার এই রাশ রাশ জল কোত্থেকে আসে তা সে কী করে বলবে।

কতদূরে গাঙ। গোসল করে কলসী ভরে জল নিয়ে আসতে আসতে সারা বছর কাঁখ ভেঙে যেতে চায় জোবেদার। নাইতে গিয়ে ঘাটে গরু আর মানুষের ভিড় দেখে কাজিদের শনের ভিটার কাছে ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর ঘাট নিরালা হলে জলে যখন নামে, তখন জল আর জল থাকে না, কাদা হয়ে যায়। গা মাথা ভেজে কি ভেজে না, কোনরকমে দুটি ডুব দিয়ে বাড়ি চলে আসে জোবেদা। খরার সময় যে গাঙ

রাঁধবার জন্যে এক কলসী পানি দিতে পারে না, বর্ষার সময় সে সব ভাসিয়ে দিতে আসে কেন, তা ময়নার মা কী করে জানবে।

ময়না যা বলেছিল, তা-ই হয়েছে। পুরনো ছোট ডিঙিখানা আজকাল বারান্দার খুঁটির সঙ্গেই বেঁধে রাখে আইনুদ্দিন। বেড়া যদি না থাকত তাহলে ঘরের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে নেওয়া যেত। মাঝে মাঝে টিনের চালের উপর ওঠে। বেয়ে বেয়ে ওঠে সবচেয়ে উঁচু আমগাছটার মগ ডালে।

ময়না বলে, "কী দেখ বাজান?"

জোবেদা শঙ্কিত হয়ে বলে, "ওখানে ওঠছ ক্যানে? পইড়া মরবা, পইড়া মরবা। নামো শিগ্‌গির।"

আইনুদ্দিন ধমক দিয়ে বলে, "থাম মাগী, দেইখা লই।"

তালগাছের মাথায় উঠে চেয়ে চেয়ে বন্যার রূপ দেখে আইনুদ্দিন। কোথাও এক ফোঁটা মাটির চিহ্ন নেই। সব জলে জলাকার, সব একাকার হয়ে গেছে। কইডুবি, সাইমুসাদি, তালকান্দি, চরকান্দি, চাঁদের কান্দির সঙ্গে তাদের পুব-সদরদি, পশ্চিম-সদরদিও জলের মধ্যে তলিয়ে রয়েছে। ডুবে গেছে বাইশ সদরদির মৌজা। আর মানুষ সেই ডুবন্ত পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরের মানুষ আশ্রয় নিয়েছে ঘরের চালে, গাছের ডালে, ডিঙিতে ডিঙিতে, তালগাছের ডোঙায়, কলাগাছের ভেলায়। মাছের মত জলচর হয়ে রয়েছে বাইশ সদরদির হিন্দু-মুসলমান, বামুন কায়েত, ধোপা নাপিত, সাহা নমঃশূদ্র, জোলা আর মোল্লারা। মাছেরও জাত আছে কিন্তু জলে ডোবা মানুষের জাত নেই।

স্ত্রীর ধমকে চমক ভাঙল আইনুদ্দিনের।

জোবেদা চেঁচিয়ে বলল, "গাছে উইঠা বইসা থাকলেই হবে নাকি। নাইমা আস। শিগগির। মাইয়াডা যে শুগাইয়া মরল। দানাপানি কিছু দেবা না ওয়ারে!"

আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল আইনুদ্দিন। বউ আর মেয়ের খোরাকের যোগাড়ে বেরোতে হবে বটে। নিজের পেটও খিদেয় জ্বলছে। কাঠা কয়েক ধান যা গোলায় তুলেছিল, বর্ষা শুরু হতে না হতে তা শেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে দিন আনা দিন খাওয়া। কিন্তু এখন আনবে কোত্থেকে? কাজ দেবে কে? পাকিস্তান হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে অবস্থাপন্ন প্রায় সব হিন্দুই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। যাদের হাতে দুটো পয়সা ছিল, তাদের প্রায় কেউ নেই! ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, পাটের দর নেই, দুধ মাছের দর পড়ে গেছে। আইনুদ্দিনের মত নিরক্ষর কামলা কিষাণকে কাজ দেবে কে। তারপর এই ভরা বর্ষা, আর সর্ব্বনাশা বন্যা।

তবু ডিঙি নৌকো নিয়ে খোরাকের সন্ধানে বেরোল আইনুদ্দিন। কাজের সন্ধানে চলল। সারা গ্রাম জলে ভাসছে। মুসলমান আর নমঃশূদ্র পাড়ার অবস্থা সব চেয়ে খারাপ। কেউ বা ঘরের মধ্যে জ্বরে ভুগছে, কারো বা ঘরই ভেঙে পড়েছে। ধোপাদের খাল দিয়ে এগোতে এগোতে আরো কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আইনুদ্দিনের। রায়েদের বর্গাদার ইয়াসিন মিঞা, ঘরামী বলাই মণ্ডল আর আইনুদ্দিনের মতই কামলা ছদন বদন দুই ভাই ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছে। আইনুদ্দিন দেখেই বুঝতে পারল, তারাও কাজের বদলে খোরাক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ইয়াসিন বলল, "কি আমু শেখ, কাজকর্ম কিছু জোটল ?"

আইমুদ্দিন হতাশভাবে বলল, "না কাজ আর কই।"

বলাই বলল, "ঘর কোন বেটার আস্তা নাই। কিন্তু ঘরামী লাগাবে না কেউ।"

ছদন বলল, "লাগাইয়া কী করবে ? ঘর আইজ সারাবা, কাইল আবার হেইলা পড়বে। তাছাড়া পয়সা কই মাইনষের ?"

ইয়াসিন বলল, "তুনিয়ায় আর কোন কাজ নাই। কেবল এক কাজ আছে। চাও তো নিশানা দিতে পারি।"

সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। "কী কাজ! কোথায়! কার বাড়িতে কও না মেঞা ?"

ইয়াসিন বলল, "এই দরিয়ার পানি সেচতে আরম্ভ কর। কাজের অভাব কী।"

সবাই রাগ করল। বে-আক্কেল ইয়াসিনের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এত তুঃখ-ধান্দার মধ্যেও ওর রঙ্গরস যায় না।

রায়বাড়ি, চৌধুরীবাড়ি ঘুরে ঘুরে সের তুই চাল শেষ পর্যন্ত যোগাড় করল আইমুদ্দিন। ললিত মিস্ত্রীর কাছ থেকে টাকাও ধার করে আনল গোটা তিনেক। নৌকো বিক্রি করে মিস্ত্রী বছর তুই ধরে বেশ লাভ করছে।

অর্ধেক চাল ভবিষ্যতের জন্যে রেখে বাকি অর্ধেক সিদ্ধ করল জোবেদা। দিন কাটল। মাচার উপরে রাত্রির অন্ধকার নামল। হ্যারিকেন একটি আছে। কিন্তু জ্বলে না। কী করে যেন জল ঢুকেছে তার মধ্যে। তেলের যোগাড় হয় নি।"

ময়না বলল, "অন্ধকারে আমার ভয় করে মা।"

জোবেদা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "ভয় কিরে পাগলী। তুইতো আমার বুকের মধ্যে আছিস। আমার দিলজান। সাপ আসুক, বাঘ আসুক, আমার জান না নিয়া তোরে কেউ ছুঁইতে পারবে না।"

আইনুদ্দিনও মেয়ের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "ভয় কি। কাইলই বাজার থিকা তেল নিয়া আসব। সারা রাইত বাতি জ্বালাইয়া রাখব ঘরে।"

পরদিন ভোরে উঠে আইনুদ্দিন ফের কাজের চেষ্টায় বেরোচ্ছে, গাঁয়ের এম. ই স্কুলের মাস্টার গোপাল সা আর ইসমাইল সিকদার এসে হাজির। উঠানের উপর দিয়ে বৈঠা বাইতে বাইতে আইনুদ্দিনের ঘরের কাছে নৌকো ভিড়াল তারা। বড় নৌকোয় শুধু তারা দু জনই নেই, পাড়ার আরো লোকজন আছে।

আইনুদ্দিন বলল, "ব্যাপার কী মাস্টার মশায়।"

গোপাল মাস্টার বলল, "তৈরি হইয়া লও। যাইতে হবে আমাগো সাথে।"

আইনুদ্দিন অবাক হয়ে বলল, "কোথায়?"

ইসমাইল সিকদার বিরক্ত হয়ে বলল, "অত জেরা-ফেরার দরকার কি। যা কইতেছি তাই কর। যাইতে হবে অনেক জাগায়। থানার বড় দারোগার কাছে যাব, সার্কেল অফিসারের কাছে যাব, আদালতের মুনসেফের কাছেও যাব আমরা। দরগায় দরগায় সিন্নি মানতে হবে। যে পীর এখন দোয়া করে।"

ব্যাপারটা আইনুদ্দিনকে ওরা আরো ভাল করে বুঝিয়ে বলল। গ্রামের লোকজন নিয়ে সরকারী সাহায্যের জন্যে দরবার করতে

যাচ্ছে তারা। ধান নেই, চাল নেই, নুন নেই, তেল নেই, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, গাঁয়ের গরিব লোক বাঁচে কী করে! একথা সরকারী লোকদের ভাল করে বুঝিয়ে সাহায্যের দাবি করতে হবে। তার জন্যে জনবল দরকার। দু জন এক জনের কাজ নয়। যত বেশি পারে, নৌকো বোঝাই করে ইসমাইল আর গোপাল মাস্টার লোকজন নিয়ে হাজির হবে শহরে। কিছু-না-কিছু সাহায্য মিলবেই। শোনা যায়, চণ্ডীদাসদির লোকেরা নাকি এইভাবে গিয়ে ধান আর কাপড় আদায় করেছে।

শুনে আইনুদ্দিন উল্লসিত হয়ে উঠল। সে নিশ্চয়ই যাবে মাস্টার মৌলবীদের সঙ্গে। এর আবার আপত্তি করবার কী আছে? তা ছাড়া এত লোকজন দেখে মনে ভারি বল এল আইনুদ্দিনের। তা হলে সত্যিই দরিয়া সেচবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এরা। সবাই মিলে জোট বাঁধলে, সব মিলে একসঙ্গে বৈঠা চালালে বন্যার জল না কমাতে পারলেও এই দুঃখের দরিয়া তারা পাড়ি দিতে নিশ্চয়ই পারবে। আধময়লা আধাভেজা জামাটা গায়ে দিয়ে তালি-দেওয়া ছাতাটা বগলে চেপে প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে চলল আইনুদ্দিন। নৌকোয় উঠবার আগে মেয়েকে আর একবার ডেকে বলল, "চললাম মা, সাবধান হইয়া থাইকো।"

ময়না বলল, "বাজান, আমার সেই ফিতা জলে ভাইসা গেছে। আমার জন্যে রাঙ্গা ফিতা আইনো।"

"আইচ্ছা।"

"আর গন্ধ-তেল। মাথায় মাখব।"

"আইচ্ছা।"

"আর এক সের কেরোসিনও মনে কইরা আইনো বাজান।
আমি কিন্তু আইজ আর অন্ধকারে থাকতে পারব না।"

আইনুদ্দিন এবার হেসে বলল, "সব আনব। তোমার জন্যে ভাঙ্গার বাজারখান সুদ্ধা নিয়া আসব মা।"

নিজের ছোট্ট ডিঙিখানা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেল ঘরের খুঁটির সঙ্গে। তালাচাবি আর লাগাল না। দেখবার জন্যে জোবেদাই তো আছে। বড় নৌকোয় উঠে বৈঠা হাতে নিল আইনুদ্দিন। ভাইপো মৈনুদ্দিন বলল, "আমিও আয়ি চাচা।" সেও চলল সঙ্গে। যতগুলি মানুষ, প্রায় ততগুলি বৈঠা। যেন বাইচের নৌকো চলেছে, বন্যার সঙ্গে বাইচ। কে বলবে গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষ অভুক্ত অর্ধভুক্ত রয়েছে কদিন ধরে। কে বলবে এদের গায়ে জোর নেই, মনে জোর নেই। এতগুলি বৈঠার ঝপাতঝপ শব্দ শুনে, এত বড় নৌকোখানাকে তীরের মত ছুটে চলতে দেখে কারো তা সাধ্য আছে বলবার? ঘাটে ঘাটে আরো লোক উঠল, আশেপাশে পিছনে আরো নৌকো ছুটল। খাল ছাড়িয়ে নদীতে পড়ল নৌকো। এপার ওপার সব একাকার হয়ে গেছে। নদী নয়, যেন সমুদ্র। স্রোত উজান বাতাস উজান। তবু সেই উজানের বিরুদ্ধে ছুটে চলল নৌকো।

শহরও জলে তলানো। কালীবাড়িতে জল, মসজিদবাড়িতে জল, থানায় জল, কাছারিতে জল। দোকানপাট স্কুল আদালত সর্ব জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। দলের মুখপাত্র ইসমাইল আর গোপাল মাস্টার সহজে কারো সঙ্গে দেখা করতে পারল না। অফিসারেরা বজরায় করে বন্যা দেখতে বেরিয়েছেন, গ্রাম-গ্রামান্তরে লোকজনের দুর্দশা

প্রত্যক্ষ করতে গেছেন। ফিরে আসতে আসতে বেলা তিনটে বাজল। দারোগা সাহেব গোপাল আর ইসমাইলের বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনলেন এবং উপর থেকে যে সাহায্য আসছে, সে আশার বাণীও শোনালেন। দু এক দিনের মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেট এদিকটা দেখতে আসবেন। তখন নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা হবে। হাতে হাতে তিনি আর কী দিতে পারেন? তাঁর সাধ্য কি। সব ওপরওয়ালার হাত।

লোকজনের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মাতব্বররা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের শান্ত করল। নৌকোয় উঠে ফের সবাই বৈঠা হাতে নিল। আগেকার মত উৎসাহ আর কারো মনে নেই। জোর নেই হাতের বৈঠায়। পেটে খিদে, বুকে জ্বালা, দেহমন অবসন্ন। বেলা পড়ে এসেছে। মাথার উপরের সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। হাতের বৈঠা পড়ে কি পড়ে না। আশ্চর্য বাৎসল্য আইনুদ্দিনের, এরই মধ্যে সে জল ভেঙে ভেঙে শহর খুঁজে খুঁজে চুলের ফিতা, গন্ধ-তেল, আর কেরোসিন তেল যোগাড় করে এনেছে। পাছে লোকে দেখে ঠাট্টা করে, তাই ছাতার তলায় লুকিয়ে রেখেছে জিনিসগুলি। তবু কারো কারো চোখে পড়ল। এবং এই নিয়ে টীকাটিপ্পনিও কাটল কেউ কেউ। কিন্তু তারা তো জানে না এই মেয়ে আইনুদ্দিনের কী, আগে পিছে আরো দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল তাদের। একটি জ্বরে, আর একটি কলেরায় শেষ হয়েছে। এখন ওই ময়নাই সব। একজন নয়, তিনজনের আদর ও একা ভোগ করে।

ঘাটে ঘাটে—ঘাটে ঘাটে নয়, ঘরে ঘরে, এখন ঘরই ঘাট—ঘরে ঘরে লোক নামিয়ে দিতে দিতে নৌকো প্রায় খালি হয়ে গেল।

খালের ভিতর দিয়ে সিকদার আর কাজী বাড়ির মাঝখান দিয়ে আইনুদ্দিনদের বাড়ির সীমানায় নৌকো এসে লাগতে না লাগতেই ভিতর থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেল। আরো দু-একখানা ডিঙি এগিয়ে এল বড় নৌকোখানার কাছে।

আইনুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বলল, "ব্যাপারডা কী। কান্দে কেডা। কী হইছে ছদন?"

ছদন ধরাগলায় বলল, "কিছু হয় নাই। আইস, ভিতরে আইস মেঞা ভাই।"

আইনুদ্দিন বলল, "কিছু হয় নাই তো আমার উঠানের ওপর অমন হাট মেলছে ক্যান। এত গোলমাল এত লোকজন কিসের?"

আর গোপন রাখা গেল না। নিজের চোখেই সব দেখতে পেল আইনুদ্দিন। তার সেই ডিঙিখানায় ময়নাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। চোখ দুটি বোজা। ঠোঁট দুটি নীলচে! চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে। চারদিকে লোকের ভিড়। মাচা থেকে ঘরের মেঝেয় জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে জোবেদা। সিকদারদের বড় বিবি, করিমের মা, দু জনেই তাকে টানাটানি করছে। কিন্তু কেউ তুলতে পারছে না।

ছদন শেখের মুখে ঘটনাটা সবাই শুনতে পেল। দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পরে মাচাব উপরে মাদুর পেতে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে ছিল জোবেদা। কাল রাত্রে ভালো করে ঘুম হয় নি। তাই শুতে-না-শুতেই চোখ ভেঙে কাল-ঘুম এসেছিল। কখন যে ময়না কোলের কাছ থেকে উঠে গেছে সে জানতেও পারে নি। ঘরের মধ্যে মাচার ওপর দিনের পর দিন বসে থেকে থেকে ময়নারও হাঁপ ধরে

গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে সে ডিঙিতে উঠে বসেছিল। বেশিক্ষণ সেখানেও বসে থাকতে ভাল লাগে নি। দড়ির বাঁধন খুলে লগি ঠেলে উঠান-সমুদ্রের এপার-ওপার হবার চেষ্টা করেছিল ময়না। কিন্তু খোঁচ দিয়ে বোধ হয় টাল সামলাতে পারে নি।

মৈনুদ্দিনের বউ লালবানুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় জোবেদার। "গেল গেল, ও চাচী তোমার মাইয়া ডুইবা গেল। ধর ধর, সর্বনাশ হইল।"

ভর দুপুর। ধারে কাছে পুরুষ ছেলে কেউ ছিল না। গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকই সাহায্যের আবেদনের জন্যে শহরে গেছে। ছদন-বদনরা কাজের চেষ্টায় গিয়েছিল দক্ষিণপাড়ার দিকে। এসে দেখে এই কাণ্ড। মৈনুদ্দিনের মা বউ আর জোবেদা তিনজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। কিন্তু সহজে খুঁজে পায় নি, তাড়াতাড়ি তুলতে পারে নি। যখন তুলেছে, তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। গাঁয়ের শ্যাম ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল ছদন শেখ। তিনি এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা-টরিক্ষা করে শেষে জবাব দিয়ে গেছেন। এখন আর কারো কিছু করবার নেই।

আইনুদ্দিন ফের ডাক্তারের কাছে ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু সবাই তাকে বাধা দিল। ধরে রাখল জোর করে।

ইয়াসিন বলল, "আর ডাক্তার-বৈদ্যের কাছে দৌড়াইয়া কী হবে মেঞা। এখন বউডারে সামলাও, খোদার নাম কর।"

আইনুদ্দিন রুখে উঠল, "খবরদার! সে শালার নাম আমার কাছে কেউ কইরো না তোমরা। কইরো না কইয়া দিলাম।"

শোকার্ত বাপকে সান্ত্বনা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ বাদে প্রতিবেশীরা প্রায় সবাই বিদায় নিল। ইয়াসিন আর ছদন শেখ রয়ে গেল শেষ কাজ করবার জন্যে। কিন্তু জোবেদা কিছুতেই ছাড়বে না মেয়েকে। সে জোর করে ময়নাকে ডিঙি থেকে তুলে মাচার উপরে শুইয়ে দিল। উপুড় হয়ে আগলে রইল তাকে।

"নিতে পারবা না। কেউ আমার দিলজানরে আমার কাছ থিকা কাইড়া নিতে পারবা না তোমরা।"

ইয়াসিন বলল, "যে যাবার সে তো চইলা গেছে বউ। এখন রইছে কেবল মাটিটুকু। মাটিরে মাটির সাথে মিশা থাকতে দাও। মাটির নীচে শান্তিতে ঘুমাইয়া থাউক তোমার ময়না।"

জোবেদা প্রতিবাদ করে উঠল, "মিছা কথা, মিছা কথা কইতেছ তোমরা। এই জলের দেশে মাটি কোথায় পাবা যে মাটির নীচে শোয়াবা আমার জানরে। তোমরা ওয়ারে জলে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্যে আইছ। তা আমি দিতে দিমু না। যে পানি আমার এমন সর্বনাশ করল তারে দিমু না আমি। দুইটা দিন সবুর কর। পইচা গইলা আমি আগে মাটি হই। সেই মাটি দিয়া ঢাইকো আমার জানরে, তবু পানিতে দিয়ো না।"

ছদন বলল, "কাইন্দা আর কি করবা বউ, খোদারে ডাক।"

জোবেদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "না খোদা, তোমারে আর ডাকব না, তুমি নাই, তুমি নাই। বানের জলে ধুইয়া গেছ, ভাইসা গেছ, তলাইয়া গেছ তুমি।"

অবুঝ মার বুক থেকে ইয়াসিনরা শেষ পর্যন্ত ময়নার মৃতদেহকে জোর করে কেড়ে নিল। সাদা কাপড় জড়িয়ে নৌকায় তুলল

তাকে। খান তিনেক কোদাল নিল সঙ্গে। ভিটে ঘাটায় যদি কোথাও এক ফোঁটা মাটি পাওয়া যায়। নৌকোয় করে তিনজনে অনেক রাত পর্যন্ত সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াল। না, কোথাও একফোঁটা শুকনো মাটি নেই। নদীর ধারে কালী খোলায় হিন্দুদের শ্মশানের উপর গলাজল। মাঠের ধারে মুসলমানের কবরখানা অনেক আগেই তলিয়েছে। তা ছাড়া কত উঁচু উঁচু জংলা ভিটা ছিল। সব ডুবেছে। বাইশ সদরদির এত বড় মৌজায় এক ফোঁটা মাটির চিহ্ন নেই। অন্ধকারে শেষ পর্যন্ত কুমারের স্রোতে ময়নাকে ছেড়ে দিয়ে এল তারা।

নদীর জলে আইনুদ্দিনের চোখের জল টপ টপ করে পড়তে লাগল। আইনুদ্দিন বলল, "যাও দিলজান, মাটির দেশে যাও। আমি তোমার মাটির ব্যবস্থা করতে পারলাম না। নিজের মাটি তুমি নিজেই খুঁইজা নিও।"

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল আইনুদ্দিন। সংজ্ঞা হারিয়ে জোবেদা তখনও ঘরের মেঝেয় জলের মধ্যে পড়ে আছে। পাঁজাকোলা করে তাকে তুলে নিল আইনুদ্দিন। শাড়ি বদলে দিল, কাঁধের গামছা দিয়ে মুছে দিল চুলের রাশ। জেগে উঠল জোবেদা। সারারাত স্বামী-স্ত্রী সেই অন্ধকারে বাঁশের মাচার উপর স্তব্ধ হয়ে জেগে রইল। আজ আর তাদের মাঝখানে কেউ নেই। আজ ঘরে কেরোসিন তেল আছে, হ্যারিকেন আছে, দিয়াশলাই আছে, কিন্তু আলো জ্বালবার প্রয়োজন নেই কারো।

জল আরো বাড়তে লাগল। তারপরে শুরু হল বৃষ্টি। অবিরাম বৃষ্টি। ক' দিনের মধ্যে লোকের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ল।

মুখ থুবড়ে ভেঙ্গে পড়ল ঘরগুলি। আইমুদ্দিনদের খালের ঘাট দিয়ে রোজই একটা দুটো করে গরু ছাগল ভেসে যেতে লাগল। মনে হল কোন কোনটা একেবারে মরে নি। জীবন্ত অবস্থাতেই ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু আইমুদ্দিন নির্বিকার।

তারপর শুধু গরু ছাগল, কুকুর বিড়াল নয়, কলেরায় দু এক জন করে মানুষও মারা যেতে লাগল। আইমুদ্দিনেরই বন্ধু জোয়ান রহমৎ কাজী মারা গেল হঠাৎ। তার বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। পাড়া-পড়শীরা অনেকেই ছুটে গেল কিন্তু আইমুদ্দিন আর জোবেদা যেন পাষাণ হয়ে গেছে। দুনিয়ার কোন ঘটনাই আব তাদের টলাতে পারে না।

আবার দেখা গেল, ইসমাইল আর গোপাল মাস্টারের নৌকা। ছাত্রদের নিয়ে, গাঁয়ের যুবকদের নিয়ে তারা নিজেরাই এবার এক সেবা-সমিতি খুলেছে। সচ্ছল সম্পন্ন গৃহস্থদের কাছ থেকে টাকা চাল আর পুরনো কাপড় চেয়ে নিয়ে গরীবদের বিলোচ্ছে। সেই নৌকোয় বৈঠা ধরবার জন্যে আইমুদ্দিনকেও তারা ডাকতে এল। টাকা পয়সা দিয়ে তো সাহায্য করতে পারবে না। গায়ে খাটতে পারবে। তাই খাটুক দশজনের জন্যে। কিন্তু আইমুদ্দিন বলল, “না মাস্টার আর না। তোমাগো নায়ে আর ওঠব না আমি। তোমাগো চক্রান্তে পইড়া আমার সব গেছে।”

গোপাল মাস্টার অনেক করে বুঝাল, “তোমারই পাড়া-পড়শী ভাইবন্ধুরা কষ্ট পাইতেছে আইমুদ্দিন। না খাইয়া, যা তা খাইয়া, রোগে ভুইগা ভুইগা মরতেছে।”

আইমুদ্দিন নিস্পৃহ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, “মরুক গিয়া।

ছুনিয়ায় মরবার জন্যেই তো সব আইছে। মানুষ মরবে এ আর এমন বেশি কথা কি।"

হুঁকো হাতে আইনুদ্দিন ফের ঘরের মাচার উপর গিয়ে বসল। এ মাচাও মচমচ করতে শুরু করেছে। এ মাচাও হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে কোন মুহূর্তে। যদি পড়ে, আইনুদ্দিন আর নতুন করে ঘর বাঁধবে না। বন্যার জল তাকে আর জোবেদাকে যেখানে খুশি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে পথে ময়না গেছে, সেই পথেই যাবে তারা। বানের জলে স্নেহমমতা, দয়ামায়া, ক্ষুধার যন্ত্রণা, শোকের জ্বালা, কিছুই আর বাকি থাকবে না। সবভাসানী সব ভাসাবে।

পরদিনও অশ্রান্ত বৃষ্টি। সারাদিন আইনুদ্দিন আর বাইরে যেতে পারল না। বাইরে যাওয়ার তেমন কোন ইচ্ছাও হল না। এই জলবৃষ্টির মধ্যে কে আর তাকে কাজ দেবে, কে দেবে খয়রাত। ঘরে অল্প যা একমুঠো চাল ছিল তার সঙ্গে কচু আর শাপলা মিশিয়ে সিদ্ধ করল জোবেদা। কোন রকমে দু গ্রাস মুখে দিয়ে জড়সড়ো হয়ে দু জনে পড়ে রইল মাচার উপর। যেভাবে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে, আর উল্টোপাল্টা বাতাস বইছে সঙ্গে সঙ্গে, তাতে ঘর ভেঙে পড়বার আগেই আকাশটা সুদ্ধ চালের উপর ধ্বসে পড়বে। আজ প্রলয় হবে পৃথিবীর। কেউ রক্ষা পাবে না। রক্ষা পেতে চায়ই বা কে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বাইরে একজন স্ত্রীলোকের গলা শোনা গেল, "ও আমুমেঞা, ও জোবেদা বিবি, দুয়ার খোল, দুয়ার খোল। বাঁচাও বাঁচাও।"

প্রথমে মনে হল আইনুদ্দিন ভুল শুনছে। এই জলবৃষ্টির মধ্যে

কে আসবে তাদের দুয়ারে। আসবেই বা কী করে। চারদিকে থৈ থৈ করছে শুধু জল আর জল। জনমানুষ কেউ আছে নাকি সংসারে যে আসবে।

আইনুদ্দিন বলল, "শুইয়া থাক জোবেদা, ও আমাগো কানের ভুল, মনের ভুল।"

কিন্তু জোবেদা বলল, "না দেইখা আসি। মাইনষের গলা শোনলাম, এখন গোংরানি শোনতেছি, কাতরানি শোনতেছি। দেইখা আসি কেডা অমন করে।"

জল ভাঙতে ভাঙতে দোর খুলল জোবেদা। তাদেব বারান্দায় এক হাঁটু জলের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক বসে বসে কাতবাচ্ছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে জোবেদা, তাকে চিনতে পেবে বলল, "ওমা, এ যে সদু মিঞার পরিবাব—সাকিনা।"

সাকিনা কাতর স্ববে বলল, "হ দিদি, আমিই। আমারে ধইরা তোল, মইরা গেলাম আমি।"

আইনুদ্দিনও এবার উঠে দাঁড়াল। আলো জ্বালল ঘরে। তাকে দেখে মুখ নিচু করল সাকিনা। তবু আইনুদ্দিন সবই বুঝতে পারল। ডাকাতির দায়ে ধরা পড়ে মাস ছয়েক আগে সদু মিঞার জেল হয়েছে। তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এতদিন বাড়িতে বাড়িতে ধান ভেঙ্গে খাচ্ছিল। এই বর্ষার ক' মাসে খুবই বিপাকে পড়েছে। তার ঘরে কোমর অবধি জল। দেখবাব শোনবাব কেউ নেই। এতদিন যে কি করে টিকে আছে তাই আশ্চর্য।

জোবেদা তাকে হাত ধরে তুলে আনল, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যথা ওঠছে নাকি?"

সাকিনা বলল, "হ।"

জোবেদা বলল, "ধইন্য মাইয়ামানুষ তুমি। এই অবস্থায় আইলা কেমনে?"

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল সাকিনার। আস্তে আস্তে বলল, "জানের দায়ে আসছি দিদি। ডোঙা ছিল ঘরের কোনায়। তাই বাইয়া বাইয়া আসছি। না আইসা করব কি। ঘরখান আইজ হেইলা পড়ল। ভয় করতে লাগল একলা একলা।"

জোবেদা বলল, "আমার এখনও ভয় করতেছে। কী সাহস তোমার। ধইন্য মাইয়ামানুষ তুমি। আইস, ঘরের মধ্যে আইস, মাচার ওপর আইস।"

সাকিনাকে জায়গা করে দিয়ে নিজে বারান্দায় এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল আইনুদ্দিন। বাইরে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে, বাতাসের শব্দের সঙ্গে গর্ভিনী নারীর গোঙানির শব্দ পাল্লা দিয়ে চলল। তারপর শেষরাত্রির দিকে জোবেদা তাকে ডেকে বলল, "আইস, ঘরে আইস এবার।"

এখন আর গোঙানি নয়, স্পষ্ট শিশুর কান্না শুনতে পেল আইনুদ্দিন।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কী হইল?"

জোবেদা জবাব দিল, "মাইয়া।"

রক্তমাখা পুরনো শাড়ি আর আইনুদ্দিনের ছেঁড়া লুঙ্গির মধ্যে শুয়ে শিশুটি তখনো কাঁদছে। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আইনুদ্দিন ফের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ভোর ভোর সময় বেড়ায় ঝোলানো বাঁশের চোঙা থেকে

তামাক নেওয়ার জন্যে আবার এল ঘরে। তখন সাকিনার জ্ঞান ফিরেছে।

চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে জোবেদাকে দেখে তার হাতখানা চেপে ধরল সাকিনা, তারপর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "তাজা আছে দিদি ?"

জোবেদা হাসিমুখে বলল, "হ বুইন, তাজাই আছে। তোমার কষ্টের ফল ফলছে। খোদার দোয়া।"

সাকিনা বলল, "তোমাগোও দোয়া। কী হইছে ? ছাওয়াল না মাইয়া ?"

জোবেদা আস্তে আস্তে বলল, "মাইয়া।"

বলে স্তব্ধ হয়ে রইল জোবেদা।

সাকিনা হঠাৎ আরো জোরে হাত চেপে ধরল তার, বলল, "দুঃখ কইরো না দিদি। বানের জলে সে-ই আবার ভাইসা আইছে। এ তোমাগো সেই ময়না।"

দাই আর প্রসূতী দু জনের চোখেই জলের ধারা নামল।

জোবেদা মাথা নেড়ে ধরা গলায় বলল, "না বুইন, না, সেই সর্বনাশীর নাম আর না, আর না।"

আইনুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল, "না না, তার নাম আর না, আর না।"

কিন্তু বুকের ভিতর থেকে প্রাণপাখি নিজের পুরনো নাম ধরে কেবলই ডাকতে লাগল, "ময়না, ময়না।"

ক্রোড়পত্র

'সুচরিতাসু

পত্রবাহক আমার একজন বন্ধু। একটি দুঃস্থা আত্মীয়াকে নিয়ে ইনি সম্প্রতি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। মেয়েটি বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই বিধবা হয়েছে। পিতৃকুলে কি শ্বশুরকুলে দেখা-শোনা করবার মত নিকটসম্পর্কীয় কেউ নেই। সামান্য লেখাপড়া জানে। কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আরো একটু পড়াশুনো কি হাতের কাজ-টাজ কিছু শিখে মেয়েটি যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার অভিভাবকেরা সেই চেষ্টাই করছেন। তোমাদের সমিতি থেকে যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারো, আমি ব্যক্তিগত উপকার বোধ করব।'

এই পর্যন্ত লিখে অসিতবাবু চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'দেখুন তো হল কিনা।'

চিঠিখানার ওপর আমি আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। অফিসের প্যাডের কাগজে লেখা চিঠি। ওপরে বড় বড় ইংরেজী হরফে অসিতবাবুদের নাতিখ্যাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নাম ঠিকানা মুদ্রিত। তার নীচে ছোট ছোট জড়ানো অক্ষরে এই সুপারিশ চিঠি সুরু হয়ে নিতান্ত মামুলী ভঙ্গীতে শেষ হয়েছে।

প্যাডসুদ্ধ চিঠিখানা ফের ঠেলে দিলাম অসিতবাবুর দিকে।

বললুম, 'হল কি না হল তা আপনিই সব চেয়ে ভালো জানেন অসিতবাবু।'

মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম। কথার সুরে সেই ক্ষোভ গোপন রাখতে চেষ্টা করলাম না। অসিতবাবুর সঙ্গে আমার আজ বছর তিনচার ধরে জানাশোনা। এক টেবিলে মুখোমুখি বসে কাজ করেছি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য, রাজনীতি থেকে সুরু করে পারিবারিক এবং দাম্পত্য সুখদুঃখের গল্প করেছি। বছর খানেক আগে এই কোম্পানীর সেক্রেটারীর পদ নিয়ে অসিতবাবু চলে এসেছেন। আমি আছি সেই পুরনো অফিসের নিচের সিঁড়িতে। কিন্তু তাই বলে আমাদের দু জনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ আলোচনায় হৃদ্যতার কোন তারতম্য ঘটে নি। তাই, সুপারিশ চিঠিখানা অসিতবাবু একটু ভালো করে ধরে লিখবেন এই আশাই করেছিলাম। কেন না, চিঠির কথা সেদিন তিনিই উপযাচক হয়ে বলেছিলেন আমাকে। অফিস-ফেরৎ ট্রামে পাশাপাশি বসে আগের মতই পুত্রকলত্র ঘর-সংসারের আলোচনা করছিলাম দু জনে। কথায় কথায় আমার মাসতুতো বোন উমার কথাও উঠে পড়ল। তার দুর্ভাগ্য আর মার দুর্ভাবনার কথা সব শুনে অসিতবাবু বললেন, 'আজকাল তো মেয়েদের জন্য কত সব ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান হয়েছে, দিন না তার কোনটিতে ভর্তি করে। লেখাপড়া কাজকর্ম শিখে স্বাবলম্বী হতে পারবে। আপত্তি না থাকলে যোগ্য ছেলে-টেলে দেখে ফের বিয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে কোন কোন জায়গায়।'

বললুম, 'আছে নাকি জানাশোনা তেমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান?'

অসিতবাবু মৃদু একটু হেসেছিলেন, 'একেবারে কি আর না

আছে? তা হলে দয়া করে বেড়াতে বেড়াতে আসুন না একদিন আমাদের অফিসে। একখানা চিঠি লিখে দেব।'

প্রায় আধঘণ্টা আমাকে বসিয়ে রেখে, কলমটা একবার খুলে আর একবার বন্ধ করে, দ্বিতীয়বার খুলে মনে মনে কিছুক্ষণ ধরে খানিক কি মুসাবিদা করে অসিতবাবু শেষ পর্যন্ত লিখে দিলেন—আর একটু যত্ন করে আর একটু আগ্রহ ঔৎসুক্য দেখিয়ে চিঠিখানা লিখলে কি ক্ষতি ছিল অসিতবাবুর?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছিলেন অসিতবাবু, হঠাৎ বললেন, 'অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে। আপনার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে চিঠি দেখে আপনি খুশী হন নি।'

বললুম, 'আমার খুশী হওয়া না হওয়া নিয়ে তো কথা নয়। আপনি লিখে খুশী হলেই হল। আমার কাজ নিয়ে কথা। তবে হ্যাঁ, কলমের রাশটা একটু কড়া করেই টেনেছেন বলে মনে হচ্ছে।'

অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, বললেন, 'তাই নাকি? তা হবে। কলমের রাশ কি ইচ্ছা করলেই সব সময় ছাড়া যায় মশাই, না ছাড়বার জো থাকে?'

বললুম, 'তার মানে?'

অসিতবাবু বললেন, 'ওই দেখুন, অমনি বুঝি কানে লেগেছে কথাটা! না কল্যাণবাবু, বড্ড প্রফেসনাল চোখ কান আপনাদের, কোন কথা বলে সারবার জো নেই। আপনারা চট্ করে মানের দিকে মন দেবেন। মানে আবার কি, মানে নেই কিছু। আসুন, বরং আর একটু চা খাওয়া যাক।'

কাঠের পার্টিসন-ঘেরা ছোট্ট কামরাটুকুর মধ্যে অন্ধকার ঘন

হয়ে এসেছে। অসিতবাবু হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন, বেল টিপে ডাকলেন বেয়ারাকে, বললেন, 'দু কাপ চা।'

তারপর চিঠি সুদ্ধ প্যাডটা টেনে নিলেন অসিতবাবু। আর একবার সম্পূর্ণ চিঠিখানা পড়ে নিজের পুরো নামটা সই করে দিলেন। ড্রয়ার থেকে অফিসেরই নামাঙ্কিত একখানা লেফাফা টেনে বের করে তার মধ্যে ভরলেন চিঠিখানা। খামের ওপর ঠিকানা লিখতে যাবেন এই সময়ে চা এসে পৌঁছল। অসিতবাবু একটু কি ইতস্ততঃ করলেন তারপর খামটা সরিয়ে রেখে নিচু হয়ে চুমুক দিলেন কাপে, পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর মৃদু একটু হেসে বললেন, 'আপনার জন্য চিঠি লিখতে লিখতে একটা গল্পের কথা মনে পড়ছিল।'

বললুম, 'গল্প!'

অসিতবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, গল্প ছাড়া আর কি। সুপারিশ চিঠি লিখে তো আপনাকে খুশী করতে পারি নি, ফাউ হিসাবে একটা গল্পের প্লট দিয়ে যদি পারি। শুনবেন? সময় আছে হাতে?'

বললুম, 'নিশ্চয়ই, গল্প শুনবার মত সময়ের আমার কখনো অভাব হয় না।'

মনে মনে কিন্তু একটু বিস্মিতই হলাম। দেখতে অমন ছিপ-ছিপে হলে কি হয় অসিতবাবু ভারি রাশভারী মানুষ। বয়স বছর বত্রিশ-তেত্রিশ। মুখ দেখলে হঠাৎ আরো কম বলে মনে হয়। চেহারায় সৌন্দর্যের চেয়ে কমনীয়তা বেশী। কিন্তু আকৃতির সঙ্গে

অসিতবাবুর প্রকৃতির যেন তেমন মিল নেই। এতদিন যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁকে গম্ভীর স্বল্পভাষী বলেই জেনেছি। এমন ভূমিকা ফেঁদে গল্পের প্লট শোনাবার আগ্রহ তিনি কোন দিনই প্রকাশ করেন নি। তাই গল্পের চাইতে গল্পকার সম্বন্ধেই বেশি কৌতূহল বোধ করে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে থাকলেও আমাকে যে দেখছিলেন না তা তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলুম। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেট টেনে চললেন—তারপর হঠাৎ সুরু করলেন, 'আজকের কথা নয়। আজ থেকে এগারো বছর আগেকার কথা। মফঃস্বল শহরের কলেজে একটি ছেলে তখন বি. এ. পড়ত। নাম ধরুন তার অরুণ। ছেলেটির বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। বাপ ছিলেন গাঁয়ের যজমানী ব্রাহ্মণ। চার পয়সা দু আনা দক্ষিণা কুড়িয়ে আর গামছায় সিধে বেঁধে ঘরে ফিরতেন। স্ত্রী আর ছেলে মেয়েতে ঘর যেমন পরিপূর্ণ ছিল বলাবাহুল্য ভাঁড়ার তেমন ছিল না। প্রিন্সিপ্যাল ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে ধরাধরি করে কলেজে হাফ ফ্রীশিপ পেয়েছিল অরুণ। দু জায়গায় দুটি ছেলে পড়িয়ে ব্যবস্থা করেছিল হোটেল-খরচের। কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতে দুটি ট্যুইশানিই হাত ছাড়া হয়ে গেল অরুণের। দুটি ছাত্রের বাবাই ছিলেন সরকারী চাকুরে। একজন স্টেশন মাস্টার আর একজন পোস্ট মাস্টার। ভাগ্যক্রমে দু জনই গেলেন বদলী হয়ে। দুর্ভাবনায় অরুণের প্রায় মাথায় হাত ওঠবার জো হল। এই সময় তাকে বাঁচাল এসে সহপাঠী বিভাস। ছেলেটির সঙ্গে অরুণের সামান্যই পরিচয় ছিল। মেলামেশা প্রায় ছিলই না। কারণ বিভাসের যা

খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল তা কলেজের মাঠে, পাঠে নয়। আর অরুণ ছিল একটু পড়ুয়া ধরণের ছেলে। দু জনেই দু জনকে আড়চোখে দেখত, সামনা-সামনি পড়লে বড় জোর একটু ঘাড় নাড়ত, আলাপটা তার বেশি আর এগুতো না।

কিন্তু বিভাস নিজেই যেচে এসে আলাপ করল অরুণের সঙ্গে। প্রায় বিনা ভূমিকায় বলল, 'শুনলাম, আপনার নাকি দুটো ট্যুইশানিই গেছে?'

অরুণ একটু অবাক হল, একটু বা অপমানিত। তার ট্যুইশানি থাক আর যাক, এই আধাপরিচিত বিজাতীয়প্রায় ছেলেটি কেন সে সম্বন্ধে খোঁজ নিতে আসবে?

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, আমার দুটো ট্যুইশানিই ছিল এ খবরও আপনি তা হলে শুনেছিলেন?'

বিভাস হেসে বলল, 'তা শুনেছিলাম বই কি। প্রফেসারদের রাবিশ লেকচারগুলি ছাড়া আর সবই আমাদের কানে যায়। চোখ কান আপনাদের তুলনায় আমাদের অনেক বেশি খোলা। আপনারা আমাদের দেখতে না পারলে কি হয় আমরা সব দেখি, সব শুনি। বকাটে ছেলে বলে আপনারা আমাদের ঘৃণা করেন। অবশ্য ভালো ছেলে বলে আপনারাও যে আমাদের কাছে শ্রদ্ধা পান তা নয় কিন্তু স্নেহ আমরা আপনাদের করি। শত হলেও আপনারা কলেজের গর্ব।'

তারপর সেই স্নেহের বাস্তব প্রমাণ দেবার জন্যই যেন বিভাস হঠাৎ প্রস্তাবটা করে বসল, 'একটা কাজ আছে আমার খোঁজে। করবেন? হাজিরা অবশ্য দু বেলাই দিতে হবে। তবে থাকতে

হবে সব মিলে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক। মাইনে মাস অন্তে পঁচিশ টাকা।'

অরুণের কাছে পঁচিশ টাকা তখন ঐশ্বর্য। হোটেল-খরচ, হাত-খরচ, কলেজের মাইনে—পঁচিশ টাকায় সব হবে। আত্ম-মর্যাদায় বেশ একটু চিড় খেল অরুণের। তবু যথাসাধ্য গম্ভীর এবং নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ কোন্ ক্লাসের ক' জন ছেলেকে পড়াতে হবে?' বিভাস হেসে বলল, 'ক' জন নয়, এক জনই। ছেলে অবশ্য প্রায় ডজন খানেক আছে ও বাড়িতে। কিন্তু ছেলে আপনাকে পড়াতে হবে না। কাজটা পড়ানো নয়, শোনানো। এখানকার ভবেশ চাটুয্যের নাম শুনেছেন তো? তিনি আমার মেসোমশাই, তাঁকে সকালে বিকালে খানিকক্ষণ করে বই আর খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হবে। বছর পাঁচ ছয় হল মেসোমশাই অন্ধ হয়ে গেছেন। রাজী থাকেন তো বলুন।'

অরুণ একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। সে যখন স্কুলে পড়ে তখন থেকেই ছেলে পড়াতে সুরু করেছে। যে সব বাড়িতে রেসিডেনসিয়াল ট্যুইশানি করেছে কেবল ছেলে পড়িয়ে কর্তব্য শেষ হয় নি, গৃহস্থের হাটবাজার করতে হয়েছে, ছাত্রের ছোট ছোট ভাই বোনকে রাখতে হয়েছে কখনো কখনো। নইলে স্কুল কলেজের ভাত নামে নি। তবু শত হলেও সে সব ছিল ট্যুইশানি। কাজটা শিক্ষাদানের, পদটা গুরুর। কিন্তু অন্ধ মনিবকে বই পড়ে শোনানোটা একটু যেন বেশী রকম চাকরীগন্ধী বলে মনে হল অরুণের কাছে। ট্যুইশানি করে পড়াটা রেওয়াজ আছে ছাত্রমহলে কিন্তু চাকরী করে পড়ার মধ্যে কেমন যেন একটু

মর্যাদা হারাবার ভয় আছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে চট করে বলা যায় না।

বিভাস বলল, 'দেখুন ভেবে। যদি রাজী থাকেন কালই কিন্তু বলবেন আমাকে। হ্যাঁ, আর একটা কথা আছে আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখা দরকার। কেবল বিষয় সম্পত্তি, যশ প্রতিপত্তির দিক থেকেই নয়, মুখে আর মেজাজেও আমার মেসোমশাই খুব নামকরা লোক। কেউ ওঁর কাছে খুব বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারেন নি। এখন আপনার কপাল আর আমার হাতযশ।'

এত সব শুনেও পরদিন অরুণ সেই পাঠকগিরি গ্রহণ করতে সম্মত হল, কাজটা একটু চাকরীগন্ধী বটে কিন্তু খানিকটা নতুন ধরনেরও। ছাত্রকে পড়া বোঝাবার দায়িত্ব নেই, পাশ করাবার দায়িত্ব নেই, কেবল মনিবের সামনে বসে গড়গড় করে ছাপার অক্ষরগুলি পড়ে যেতে হবে। সময় আর সামর্থ্য বাঁচিয়ে নিজের পড়াশুনোর কাজে তা লাগাতে পারবে অরুণ। বদ্‌মেজাজ বলে ভয় কি। কর্তব্যে যদি কোন ত্রুটি না হয় মেজাজ দেখাবার সুযোগই পাবেন না। সব চেয়ে যা বড় কথা মাস অন্তে পঁচিশটি টাকা এখন আর কে তাকে দিচ্ছে। মুখ আর মেজাজ মনিবের যেমনই হোক, টাকার ওপর তো আর সে মুখ মুদ্রিত থাকবে না। টাকায় তো রাজার মুখই থাকবে।

কিন্তু কাজটা যত সহজ ভেবেছিল অরুণ সুরু করে দেখল তত সহজ নয়। প্রথম দিন কয়েক ভালোই কাটল, তারপর বড়ই বাড়াবাড়ি সুরু করলেন ভবেশবাবু। ষাটের কাছাকাছি হবে বয়স কিন্তু চিত্ত পাঁচ ছয় বছরের ছেলের মত চঞ্চল। খেয়ালের অন্ত

নেই। এই পড়তে বলেন 'মহাভারতের শান্তিপর্ব', তার দশ মিনিট বাদে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর তার ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে 'প্রজাস্বত্ব আইন'। কোনোদিন ধমকে ওঠেন, 'জ্বর হয়েছে নাকি তোমার মাস্টার? সাগু খাচ্ছ নাকি যে চিঁ চিঁ করছ অমন করে? জোরে জোরে গলা ছেড়ে পড়। বই পড়তেই তোমাকে রেখেছি। ভূতের মন্তর পড়বার জন্য তো তোমাকে ডাকি নি।'

পরদিন যদি স্বরগ্রাম একটু চড়িয়ে দেয় অরুণ, ভবেশবাবু অমনি কানে আঙ্গুল দেন, 'আস্তে হে ছোকরা আস্তে। চোখে দেখতে পাই নে বলে কি আমাকে কালাও ঠাওরালে নাকি তুমি? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কানের পর্দা ফুটো ফুটো করে ফেলবার মতলব বুঝি? চোখ দুটো তো গেছেই এবার কান দুটোও যাক, তা হলেই আমার ছেলে-ভাইপোরা বগল বাজিয়ে নাচতে পারবে।'

কোনদিন বা উচ্চারণতত্ত্ব বোঝান তিনি অরুণকে, 'দেখ মাস্টার কথায় বলে শব্দব্রহ্ম নাদব্রহ্ম। আর সেই শব্দের প্রাণ উচ্চারণের মধ্যে। বামুনের ছেলে কিন্তু জিভটি করেছ একেবারে শূদ্রের মত। উচ্চারণেই যদি কিছু বোঝা না গেল, তাতেই যদি ভুল রইল, তোমার মুখ থেকে শাস্ত্র শুনে আমার কোন্ অক্ষয় স্বর্গবাস হবে শুনি। কি একখানা জিভই করেছ। বিশুদ্ধভাবে না বলতে পারো দেবভাষা, না রাজভাষা। একেবারে চাষাড়ে জিভ। যা বলছি শোন। একটা জিভছোলা কিনে নাও। তারপর রোজ দু বেলা সকালে বিকালে চেঁছে চেঁছে পরিষ্কার করো জিভ। দেখবে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে, উচ্চারণও আটকাবে না। বুঝেছ?'

বুঝতে অরুণের বাকি ছিল না। দেবভাষাই হোক আর

রাষ্ট্রভাষাই হোক কোন বইয়ের ভাষার সঙ্গে ভবেশবাবুর মনের ভাষার মিল ছিল না। ছাপার অক্ষর কোনদিনই তাঁর কাছে রসক্ষরা বলে মনে হয় নি। তাঁর চিত্ত-বিনোদনের জন্য ছেলেরা নানা রকম ব্যবস্থাই করেছিল। কীর্তন ভজন শোনাবার জন্য সুকণ্ঠ গায়ক ছিল এক জন, কলকাতা থেকে নতুন নতুন রেকর্ড কিনে পাঠাতেন এক ভাইপো, বেড়াবার জন্য ঘোড়ার গাড়ি বাঁধা ছিল একখানা, সকালে বিকালে তাঁর খেয়াল অনুযায়ী হাত ধরে বাগানে কি পুকুরের ধারে কিংবা চাঁদমারীর মাঠে বেড়িয়ে আনবার জন্য ছিল আলাদা লোক। কিন্তু কিছুতেই চিত্তে শান্তি পান নি ভবেশবাবু। শেষে এক অধ্যাপক বন্ধু বুঝি পরামর্শ দিয়েছিলেন বই শুনবার। জিনিসটা তাঁর কাছে নতুন বলে কিছুদিন মন্দ লাগে নি। কিন্তু দিন কয়েক পরে ফের একঘেয়ে লাগতে লাগল। পাঠে কিছুতেই রস পেলেন না। ঘনঘন পাঠক বদলি হতে লাগল কিন্তু এ পদটা একেবারে তুলে দিলেন না। সংসারের আপনজন তো নিতান্ত দায়ে না পড়লে তাঁর বড় একটা খোঁজ খবর নেয় না। মাইনে-করা যত হরেক রকমের লোককে নিজের সেবায় নিয়োগ করে রাখা যায়, ততোই ভালো। এমনি করে নিজের যতটুকু গুরুত্ব আর মর্যাদা বাড়ানো যায় মন্দ কি। সব রকমেই তো তিনি বঞ্চিত হয়ে আছেন, ভোগ সুখ তো সব উঠে গেছে সংসার থেকে। খসুক কিছু গাঁটের কড়ি ছেলে-ভাইপোদের।

অভিযোগের অন্ত নেই ভবেশবাবুর। কেবল চোখই তো তাঁর যায় নি, চোখের সঙ্গে সঙ্গে সব গেছে। ছেলেদের পিতৃভক্তি নেই, স্ত্রীর নেই পতিপ্রেম, পুত্রবধূরা যার যার ঘর সংসার ছেলেপুলে নিয়ে

ব্যস্ত, সবাই এড়িয়ে চলছে ভবেশবাবুকে—সবাই হেনস্থা করছে। অথচ এত সব বিষয়সম্পত্তি, জোতজমি, ক্ষেত, খামার, জলা, সহরের উপান্তে এত বড় দোতালা পাকা বাড়ি, আম কাঁটাল সুপারি নারকেলের বাগান সব প্রায় ভবেশবাবুর নিজের হাতে করা। নিজের বুদ্ধিবলে আর বাহুবলে। অথচ সে সব কথা পরিবারের আর কারও মনে নেই। বেঁচে থাকতেই তিনি বাদ পড়ে গেছেন সংসার থেকে। দূরে বাড়ির এক কোণে তাঁকে সরিয়ে রেখেছে সবাই।

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। ছেলেরা, ভাইপোরা, বউরা, নাতি-নাতনীরা কেউ বড় একটা তাঁর কাছে ঘেঁষে না। সবাই ভয় করে তাঁর গালাগাল-বকাবকিকে। তারা কাছে এলে তারাও সুস্থ থাকতে পারে না, ভবেশবাবুর নিজেরও অসুস্থতা বাড়ে।

সমস্ত পরিবারটির মধ্যে কেবল একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। ভবেশবাবুর ছোট মেয়ে। বছর ষোল সতের হবে বয়স। কিন্তু প্রভাবে প্রতিপত্তিতে বাড়ির সবাইকে সে ছাড়িয়ে গেছে। অন্ধ বদ্‌মেজাজী ক্রোধান্ধ বাপকে সে-ই কেবল আয়ত্তে আনতে পারে। বকতে, গালাগাল দিতে মেয়েকেও কসুর করেন না ভবেশবাবু। তবু মেয়ে ছাড়া দু দণ্ড তাঁর চলে না। ভবেশবাবু কখন খাবেন, কখন ঘুমোবেন, কখন বেড়াবেন, কখন কি বই শুনবেন, কোন্ রেকর্ড শুনবেন সব মেয়েটির নখদর্পণে। তার অনুমোদন ছাড়া কিছুই হবার জো নেই, মেয়েটি—'

অসিতবাবুকে বাধা দিয়ে বললুম, 'যতদূর মনে হচ্ছে এই অসীম প্রভাবতী প্রভাবশালিনী মেয়েটিই আপনার নায়িকা। কিন্তু কেবল

কি গুণ বর্ণনা করলেই একটি মেয়েকে ফুটিয়ে তোলা যায় মশাই ? তার চেহারা কেমন ছিল বলুন, রূপের বর্ণনা দিন।'

অসিতবাবু বললেন, 'রূপ ? ক্ষমা করুন মশাই, আমি মোটেই রূপদক্ষ নই। গল্প উপন্যাসের নায়িকার রূপের মত এক কথায় অবর্ণনীয় বলেই না হয় ধরে নিন।'

বললুম, 'আচ্ছা, রূপের কথা না হয় গেল। নাম ? নাম একটা রাখবেন তো ?'

অসিতবাবু একটু হাসলেন, 'কেন, অনামিকা রাখলে চলবে না ?'

বললুম, 'তাও চলে। তবে ডাকবার সময় ছোট করে অনু বলেই না হয় ডাকবেন সংক্ষেপে।'

এবার তারিফের ভাঙ্গতে অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, তারপর বললেন, 'না অনু নয়। অত মৃদু মিহি নামে চলবে না। ভবেশবাবুর মেয়ের নাম জয়ন্তী। কেবল গুণ নয়, দোষও জয়ন্তীর কম ছিল না। ওই বয়সে অমন অহঙ্কারী, দেমাকী, রাশভারী মেয়ে অরুণ আর কোনদিন দেখে নি।'

সে দেমাক যে জয়ন্তী মুখ ফুটে প্রকাশ করত তা নয়। তার চালচলনে ভাবে-ভঙ্গিতে সে দেমাক আপনিই ফুটে বেরুত। বাপের জন্য নিজের হাতে চা জলখাবার তৈরী করে নিয়ে আসত জয়ন্তী, কাঁচের আলমারী খুলে বের করত নানা ধরনের বই, ইংরেজী বাংলা তিন চারখানা খবরের কাগজ এনে অরুণের টেবিলে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে যেত। প্রায় সপ্তাহখানেকের মধ্যে অরুণের সঙ্গে কথা বলবার তার কোন দরকারই হয় নি। কিন্তু তার

নিঃশব্দ যাতায়াতে এই কথাটিই যেন মুখর হয়ে উঠত যে সে মনিবের মেয়ে আর অরুণ তাদের পঁচিশ টাকা মাইনের চাকুরে। মাঝে মাঝে বাপের পাশে বসে বসে জয়ন্তী পড়া শুনত অরুণের। ক্লাসের টীচার যেন ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে তার পাঠের যতি-বিরতির ভুল ধরবার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে, জয়ন্তীর ভঙ্গিটা প্রায় সেই রকমই দেখতে হত। জয়ন্তীর অবজ্ঞার জবাবটা অরুণও ঔদাসীন্যের ভাষায় দিত। কোন কৌতূহল, কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ পেত না অরুণের চোখে। সে চোখ ঢাকা থাকত বইয়ের পাতায়। সে আর তার শ্রোতা ছাড়া যে তৃতীয় কারও অস্তিত্ব আছে ঘরে সে সম্বন্ধে তার চেতনা মোটেই ধরা পড়ত না।

শহরে খবরের কাগজ যায় বিকালের গাড়িতে। সন্ধ্যাবেলায় শোনাতে হয় সংবাদ-পত্র। খান দুই কাগজ আগাগোড়া পড়ে শুনিয়ে অরুণ উঠতে যাচ্ছে হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলের উপর মাইকেলের গ্রন্থাবলী। একটু অবাক হল অরুণ। কেন না কাব্যপাঠের প্রোগ্রাম এখন নয়। হয়তো ভুলেই কেউ নামিয়ে রেখেছে বইখানা মনে করে অরুণ বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে, জয়ন্তী ভবেশবাবুকে ডেকে বলল, 'বাবা, তুমি সেদিন মেঘনাদবধ শুনতে চেয়েছিলে না? শোন না একটু।'

ভবেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখন মেঘনাদবধ?'

জয়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, দয়ালদাস তো ছুটি নিয়ে গেছে বিয়ে করতে। সে তো ক' দিন আর আসতে পারবে না। এ সময়টায় বই-টই শুনলে পারো খানিকক্ষণ।'

দয়ালদাসের নাম অরুণ এর আগেও শুনেছে। কীর্তন ভজন

শুনায় সে ভবেশবাবুকে। ভবেশবাবু বললেন, 'কথাটা মন্দ বলিস নি। পড়ো মাস্টার, মেঘনাদবধখানাই পড়ো। গোড়া থেকেই সুরু করো না। সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু' চূড়ামণি। এম. ই. স্কুলের ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশে খানিকটা পাঠ্য ছিল আমাদের। বেড়ে লিখেছে।'

অরুণ একটু ইতস্তত করে গম্ভীর মুখে ফের গিয়ে বসল চেয়ারে। তারপর পড়তে সুরু করল মেঘনাদবধ। কণ্ঠে অসন্তুষ্টি আর বিরক্তির সুর চাপা রইল না। একটু বাদেই ঢুলতে সুরু করলেন ভবেশবাবু। আর সেই ফাঁকে অরুণ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। জয়ন্তী একবার তাকাল অরুণের দিকে, তারপর ভবেশবাবুকে ডেকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'কেমন লাগছে বাবা? আরো একটু শুনবে?'

ভবেশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, থামলে কেন মাস্টার পড়ো পড়ো। বেশ লিখেছে ইটালী আবিসিনিয়াব কথাটা। মুসোলিনীই বুঝি জিতে চলেছে?'

অরুণ অদ্ভুত একটু হেসে বইখানা বন্ধ কবে বলল, 'আমি এবার যাই চাটুয্যেমশাই আপনি বরং ঘুমোন।'

জয়ন্তী বলল, 'বাবা, সর্গটা উনি শেষ না করেই যেতে চাইছেন।'

কৌচে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলেন ভবেশবাবু, এবার তড়াক করে উঠে বসলেন, 'যেতে চাইছেন? উঁহু, উঁহু, সর্গ শেষ করো মাস্টার, সর্গ শেষ করো। ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেছ কি ধরা পড়েছ আর চাকরি গেছে। নাঃ, কাউকে আর বিশ্বাস করবার জো নেই

সংসারে। লঙ্কায় যে আসে সে-ই রাবণ। ভবেশ চাটুয্যের কাছে যে আসে সেই জোচ্চোর ফাঁকিবাজ। বিভাসের কাছে শুনলুম ছেলেটি গরীব, ছেলেটি ভালো। তোরাও তো সবাই গোড়ায় তাই বলেছিলি। অথচ দেখ দেখি কাণ্ড। সর্গটা শেষ না করেই উঠে পালাতে যাচ্ছিল। আচ্ছা জয়ন্তী, যত পাঠক আসবে আমার কাছে সবাই ঠগ্ হবে? সংসারে কারো ওপর একটু নির্ভর করা যাবে না? না ছেলেদের ওপর না ভাইপোদের ওপর—'

জয়ন্তী বলল, 'তুমি ভেব না বাবা। আমি যতক্ষণ আছি কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না।'

অরুণ বলল, 'ফাঁকি আপনাকে কেউ দিচ্ছে না চাটুয্যেমশাই। সন্ধ্যায় কেবল আপনি খবরের কাগজ শুনতেন, তাই শুনিয়েই চলে যাচ্ছিলুম। মেঘনাদবধ কি আরো খানিকক্ষণ আপনি শুনতে চান?'

ভবেশবাবু রূঢ় স্বরে বললেন, 'শুনতে চাই বা না চাই। সর্গটা তুমি আগে শেষ করো তারপর যাও। কাজ কেউ অর্ধেক করে ফেলে রাখবে তা আমি কোনদিন সহ্য করতে পারি নে।'

মেঘনাদবধ আরো খানিকক্ষণ এগুতে না এগুতে ভবেশবাবু ফের ঢুলতে সুরু করলেন। অরুণ কোনরকমে সর্গটা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কারো অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করল না।

ফিরে এসে হোটেলের খাওয়া সেরে অনেক রাত পর্যন্ত নিজের পড়াশুনো করল অরুণ। তারপর দীপ নিবিয়ে শুয়ে পড়ে মনে মনে সংকল্প করল এই পাঠকগিরি আর নয়। মাসখানেক না হয় ধার কর্জ করে চালাবে বন্ধুদের কাছ থেকে। তারপর একটা না

একটা ট্যুইশান কোথাও জুটে যাবেই। কিন্তু এই খেয়ালী বড়-লোক আর তাঁর খেয়ালী দেমাকী মেয়ের খোস-খেয়াল সহ্য করবার আর কোন মানে হয় না। এ পর্যন্ত কেউ জোচ্চোর ফাঁকিবাজ বলে নি অরুণকে। কর্তব্যে কোনদিন কেউ তার ত্রুটি ধরতে পারে নি। বিনা কারণে ধরেছেন কেবল ভবেশবাবু আর তাঁর মেয়ে। তাঁদের কথার একমাত্র জবাব কাজ ছেড়ে দেওয়া। তাই দেবে অরুণ। কাল গিয়ে সকালের পাঠটুকু শেষ করে জানিয়ে আসবে পদত্যাগের কথা।

সকাল বেলা পাঠ স্থুরু হয় মোহমুদ্গরে। তাকিয়া ঠেস দিয়ে আলবোলা টানতে টানতে রোজ ভোরে জীবনের অনিত্যতার কথা শুনতে থাকেন ভবেশবাবু। অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন আরো নিস্পৃহ আর গম্ভীর মুখে অরুণ এসে বসল ভবেশবাবুর সামনের চেয়ারে। জয়ন্তী এসে ঘরে ঢুকল। মুখে কঠিন গাম্ভীর্য, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে জয়ন্তী খুলে ফেলল কাঁচের আলমারী। বের করল প্রাতঃপাঠ্য মোহমুদ্গর, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা, পকেট-সংস্করণের শ্রীশ্রীচণ্ডী।

গম্ভীরভাবে মোহমুদ্গরখানা টেনে নিল অরুণ। সে আজ তৈরী হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দেড়েক। তারপরেই এঁদের মোহ ভাঙবে। স্পষ্টভাষায় মুখের ওপর কাজ ছাড়বার কথা বলে দেবে ভবেশবাবুকে। কালক্ষেপ না করে পড়া স্থুরু করল অরুণ।

'নলিনীদলগত জলমতিতরলম্—'

কিন্তু হঠাৎ সেই মোহমুদ্গরের পাতায় ভাঁজকরা এক টুকরো

নীলাভ কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল অরুণের। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে তার নিজের নামটুকু লেখা আছে তাতে। কৌতূহল সংবরণ করা সম্ভব হল না। চিঠিটুকু হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে ফেলল অরুণ।

'কেমন, দেখলেন তো মজা? আর দেবেন ফাঁকি? এসেই অমন আর পালাই পালাই করবেন? আহাহা, কি পড়াটাই না পড়লেন কাল। বাবার দোষ নেই, আপনার কাব্যপাঠ শুনলে যে কোন লোকের খবরের কাগজ পাঠ বলেই মনে হত। তবু আপনি বলতে চান যে ফাঁকিবাজ নন?'

চিঠিতে সম্বোধনও ছিল না, স্বাক্ষরও ছিল না। কিন্তু লেখাটুকু কার বুঝতে বাকি রইল না অরুণের।

ধমক দিয়ে উঠলেন ভবেশবাবু, 'বলি ও ছোকরা, হল কি তোমার? দু ছত্র পড়তে না পড়তেই বাকরোধ হয়ে গেল নাকি? না! তোমাকে দিয়ে আর কাজ চলল না আমার।

থতমত খেয়ে অরুণ চিঠিটুকু পকেটে পুরে ফিরে পড়তে সুরু করল, 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং—'

কিন্তু এ মুদ্গরে, এ ধর্মবাণীতে কি কোন একুশ বছরের যুবকের মোহ ভাঙে, না কোনদিন ভেঙেছে?

'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং—'

নিষ্প্রাণ স্বরে আবৃত্তি করে চলল অরুণ কিন্তু সতৃষ্ণ অপলক দুটি চোখে তাকিয়ে রইল এক সপ্তদশী তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠীর দিকে।

ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে একটু আগে ঘরে ঢুকেছে জয়ন্তী।

ভোরেই স্নান সেরে নিয়েছে। ভিজে ঘন কালো চুলের রাশ পড়েছে কটি ছাড়িয়ে। খয়েরী রঙের শাড়িটি বেশ মানিয়েছে সুঠাম তনু দেহের গৌরবর্ণের সঙ্গে।

ভবেশবাবুকে চা পরিবেশন করে আর একটি কাপ অরুণের ছোট টেবিলটুকুর উপর রেখে দিল জয়ন্তী। প্রথম দিনই অরুণ জানিয়ে দিয়েছিল সে চা খায় না। তাবপর থেকে কেউ আর তাকে চা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে নি। কিন্তু আজ যখন শুভ্র সুন্দর ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের মত একটি চায়েব কাপ এসে পৌঁছল মোহমুদ্গরের পাশে, এসে পৌঁছল 'চা চাইনে', তার সমস্ত অস্তিত্ব মুখর হয়ে উঠল 'চাই, চাই, সব চাই।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অন্ধ ভবেশবাবু বললেন, 'কই মাস্টার, হল কি তোমার?'

নিজের হাতেব চায়েব কাপটি তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে অরুণ সঙ্গে সঙ্গে তোতাপাখীব মত বলে উঠল, 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং...'

জয়ন্তীর গম্ভীর সুডৌল মুখখানি হাসির আভায় চিক্‌চিক্ করে উঠল। আভাস দেখা গেল ছোট ছোট সাদা মুক্তার মত বিন্যস্ত-করা কটি দাঁতের। তারপর কি একটি কাজের ছলে সেখান থেকে সরে গেল জয়ন্তী।

অরুণের পদত্যাগ করা আর হল না।

তারপর কখনো মোহমুদ্গরের পাতার ফাঁকে, কখনো শ্রীমদ্ভাগবতে, কখনো হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে টুকরো কাগজগুলির আদানপ্রদান চলতে লাগল। দিনের পর দিন ভাষা বদলালো, ভঙ্গি

বদলালো, স্বাক্ষর সম্বোধন সুরু হয়ে অদল-বদল হল তাদেরও। জয়ন্তী কি অরুণের শান্ত গম্ভীর মুখ দেখে বাইরে থেকে কিছু বুঝবার জো ছিল না। কিন্তু কলমের মুখ তাদের ক্রমেই খুলে যাচ্ছিল।

কথাবার্তাও সুরু হয়েছিল অরুণের আর জয়ন্তীর। সব কথাই অবশ্য ভবেশবাবুর সম্বন্ধে। তাঁর সেবা পরিচর্যা, রুচি অরুচির কথা। কখনো বা আলোচনা হত পঠিত বইয়ের কখনো বা সংবাদপত্রীয় রাজনীতির। তবু সেইসব অবান্তর কথার মধ্যে গূঢ়ার্থ অন্তরের কথা থাকত ভরা; চিঠি তখন পরস্পরকে না লিখলেও চলত। যদিও ভবেশবাবুর ঘরের আলমারীর বই আর কেউ ছোঁয় না, যদিও আলমারীর চাবি জয়ন্তীর আঁচলেই বাঁধা থাকে, তবু সাবধানের মার নেই, শাস্ত্রে আছে 'শতং বদ মা লিখ।' কিন্তু না লিখে কি পারা যায়। না লিখলে মনে হয় অর্ধেক হল আর বাকি রয়ে গেল অর্ধেক। Writing makes a man perfect— এ প্রবচনের সঙ্গে এ কথাও সত্য যে writing makes love complete.

শঙ্কিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তারা তাকাত ভবেশবাবুর দিকে। তাঁর চোখের অনড় মণি দুটির কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু মেজাজের পরিবর্তন যেন তাঁর সুরু হয়ে গিয়েছিল। সেবা শুশ্রূষায় উৎসাহ আর মনোযোগ যেন আরো বেড়ে গেছে জয়ন্তীর। ভারি স্নিগ্ধ মধুর শোনাচ্ছে অরুণের কণ্ঠ। ঘড়ির কাঁটা দেখে তোতাপাখীর মত সে কেবল বই আর খবরের কাগজ ক'খানা পড়ে দিয়েই উঠে যায় না, পড়া শেষ হ'য়ে গেলেও বসে বসে গল্প

করে ভবেশবাবুব সঙ্গে। তাঁর অন্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় পৃথিবীকে। নবীন লেখকদের ফাঁকে ফাঁকে নবীনতর লেখকদের কাব্য উপন্যাস পড়ে শোনায়, পড়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। চন্দ্রসূর্যের আশেপাশের গ্রহনক্ষত্রের খোঁজ খবর দেয়। জয়ন্তী বই তোলে, বই নামায়, অন্ধ বাপের পরিচর্যা করে। চা, জল খাবার এনে দেয় ভবেশবাবু আর অরুণের জন্য। আনে মুখশুদ্ধি, চা ধরলেও অরুণ তখনও পান সিগারেট ধরে নি। হাত পেতে নেয় একটি লবঙ্গ কি একটু হরিতকির টুকরো। নিতান্ত সাত্ত্বিক, বিশুদ্ধ বস্তু। জয়ন্তী আলগোছে যেন ওপর থেকে ছুঁড়ে দিতে চায় কিন্তু কি করে যে আঙুলগুলি আপনিই নেমে আসে, ছোঁয়া লেগে যায় অরুণের হাতেব তালুব সঙ্গে তা কেউ বুঝে উঠতে পারে না। জয়ন্তী আরক্ত হয়ে ওঠে, রোমাঞ্চিত হয় অরুণ।

কিন্তু বাড়িতে তো কেবল অন্ধ ভবেশবাবুই ছিলেন না, তাঁর চক্ষুষ্মান পুত্র কলত্রও ছিলেন, ছিলেন পুত্রবধূ, ভাইঝি, ভাগ্নীর দল। এতগুলি চোখকে ফাঁকি দিতে পাবা কি সহজ! অরুণ আর জয়ন্তী অবশ্য খুব চেষ্টা করত গম্ভীর হয়ে থাকতে, তৃতীয় কারো উপস্থিতিতে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্যের অভিনয় করতে, কিন্তু দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু জনের চোখে যে আনন্দের আলো জ্বলে উঠত তাতে তাদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা গোপন থাকত না। সব কিছুই সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেত। অরুণ আর জয়ন্তীর অলক্ষ্যে বাড়ির অন্যান্য পরিজনের পাহারা আরও সতর্ক হয়ে উঠল, দৃষ্টি হল অনুসন্ধিৎসু। তারপর একদিন জয়ন্তীর বড় বউদি বারান্দার অন্ধকারে তাদের একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেললেন।

দেখে ফেললেন অরুণের হাতের মধ্যে ধরা জয়ন্তীর হাত। জয়ন্তী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল। অরুণ ছু পা এগুতে যাচ্ছিল, বড় বউদি বলল, 'দাঁড়ান। আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

একটু বাদেই এলেন জয়ন্তীর মা। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন অরুণের দিকে, বললেন, 'দাঁড়াও।'

অরুণের পাশ দিয়ে তিনি ঢুকলেন গিয়ে স্বামীর ঘরে। অরুণ তাঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। জয়ন্তীর মা অরুণকে শোনাতেই চাইছিলেন।

জয়ন্তীর মা স্বামীকে বললেন, 'ওর অনেক ভাগ্য বড় খোকা মেজো খোকা আজ বাড়ি নেই। তা হলে হাড় আর মাস তারা আলাদা করে ফেলত। কিন্তু কেলেঙ্কারি আর বাড়িয়ে কাজ নেই, লোকে হাসবে। শুধু ডেকে বলে দাও কাল থেকে ওকে আর আসতে হবে না।'

ভবেশবাবু বললেন, 'কার কথা বলছ!'

জয়ন্তীর মা সখেদে বললেন, 'কার কথা বলছি! হায় আমার কপাল, এমনি যদি না হবে চোখ দুটো যাবে কেন তোমার। অরুণ গো অরুণ। তোমার ওই পাঠক ছোকরা।'

ভবেশবাবু বললেন, 'কেন, আগেকার বুড়ো পাঠকগুলির চাইতে-ও তো ভালোই কাজ করছে। কাজে মোটেই ফাঁকি দেয় না, উচ্চারণও বেশ শুধরেছে। আর আমার পাঠক তাড়াবার জন্য তোমার এতো মাথাব্যথা কিসের? তাছাড়া এ ঘরে তুমি এলেই বা কেন। ঠাকুর চাকর, নাতিনাতনীর রাজ্যে তো তুমি

বেশ রাজরাণী হয়ে আছ। অরুণ না এলে চলবে কি করে? আমাকে বইপত্র কে পড়ে শোনাবে, তুমি?'

জয়ন্তীর মা বললেন, 'কেন, তোমার গুণের মেয়েই রয়েছে। আজ দু তিন বছর ধরে বলছি বিয়ে দাও, বিয়ে দাও, এবার হল তো?'

ভবেশবাবু বললেন, 'কি হল!'

জয়ন্তীর মা আবাব বললেন, 'হবে আমার কপাল।' তারপর ফিস্‌ফিস্ করে স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বললেন। দু তিন মিনিট নিঃশব্দে কাটল। অরুণ ভাবল এবার ভবেশবাবু চীৎকার করে উঠবেন, এবার বজ্রগর্জনে ডাক পড়বে তার।

কিন্তু ভবেশবাবুকে মৃদুকণ্ঠে বলতে শোনা গেল, 'অরুণরা পদবীতে কি?'

ভবেশবাবুর স্ত্রী বললেন, 'চক্রবর্তী। কেন, তা দিয়ে তোমার কি হবে?'

ভবেশবাবু বললেন, 'না, অমনিই জানতে চাইছিলাম। বাড়ির অবস্থা কি রকম!'

ভবেশবাবুর স্ত্রী রুক্ষস্বরে বললেন, 'শুনছি তো যজমানী করে বাপ। দিন আনে দিন খায়। আর ছেলের এখানে পাঁচ দুয়ারে ভিক্ষা করে পড়ার খরচ চলে। কেন তা দিয়ে কি হবে তোমার?'

ভবেশবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না, এমনিই জানতে চাইছিলাম।'

জানাজানি খুব বেশি হতে দিলেন না জয়ন্তীর মা কি তাঁর বড় খোকা, মেজো খোকারা। সপ্তাহখানেকের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক হয়ে

গেল। মহকুমা সহরে ওকালতি করে ছেলে। সদ্য পাশ করে এসে বসলেও ইতিমধ্যেই নাকি নাম তার বেশ ছড়াতে সুরু করেছে। বংশে মুখোপাধ্যায়। বাপ মা ভাই বোন সব আছে। পাকা বাড়ি আর পর্যাপ্ত ভূসম্পত্তি আছে গাঁয়ে। রূপে, গুণে, স্বাস্থ্যে স্বভাবে এমন ছেলে কদাচিৎ মেলে। পণ যৌতুকের দাবী অবশ্য কিছু বেশি।

জয়ন্তীর মা বললেন; 'তা হোক। তবু এ-সম্বন্ধ হাতছাড়া করব না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। সব চেয়ে কাছাকাছি যে দিন আছে পাঁজীতে পাত্রপক্ষকে বলে সেই দিনই ঠিক করে ফেল। টাকা তোমাদের হাতে না থাকে গায়ে গয়না তো আমার আছে।'

জয়ন্তীর বিয়ের দিন দুই পরে একখানা খামের চিঠি হাতে এল অরুণের। গোপন হাত-চিঠি নয়, বইয়ের পাতার আড়ালে ছোট ছোট টুকরো নয়, প্রকাশ্য ডাকের চিঠি। কলেজের ঠিকানায় পিয়ন এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। ক্লাস শেষ হলে কলেজ কম্পাউণ্ড পেরিয়ে পুকুরের ধারে নির্জন ঝাউ গাছটার তলায় এসে লেফাফার মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা খুলে ধরল অরুণ। অত্যন্ত পরিচিত হস্তাক্ষর। স্বাক্ষর সম্বোধন এ চিঠিতেও কিছু নেই। কিন্তু প্রতিটি অক্ষর জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বল্‌ছে।

'ভেবেছিলুম শত হলেও তুমি পুরুষ। তুমি কিছুতেই চুপ করে থাকবে না, তুমি কিছুতেই মুখ বুজে সইবে না। তুমি দাঁড়াবে বুক ফুলিয়ে—সমস্ত শাসন ভৎর্সনা, লাঞ্ছনা গঞ্জনার সামনে তুমি দাঁড়াবে মুখোমুখি। আমি যে চোখ বুজেছিলুম, আমি যে মুখ বুজেছিলুম সে কি কেবল ভয়ে? সে কি কেবল লজ্জায়? তা নয়,

নিশ্চিন্তেও। ভেবেছিলুম তুমিই তো আছ, তুমি থাকতে আমার ভাবনা কি। কিন্তু দেখলুম যা ভেবেছিলুম সব ভুল। ভালোই হয়েছে সে ভুল এত অল্পেই ধরা পড়ল, এত অল্পেই চুরমার হল ভেঙে।'

হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল চিঠিখানা। চমকে উঠে মুখ ফিরাল অরুণ। দেখল বিভাস মুখ মুচকে হাসছে। কিছু কিছু বিভাস আগেই জানত। কেন না ইতিমধ্যে অরুণের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এবার সব কিছুই জানল। তারপর ধিক্কার দিয়ে বলল, 'সত্যিই তুমি কাপুরুষের অধম। পুরুষের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে! পরম অপদার্থ।'

অরুণ পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। কোন জবাব দিল না। বিভাসের কথাবও নয়, জয়ন্তীর চিঠিরও নয়। জবাব দেওয়ার কিই বা ছিল। দিন কয়েক আগে লোক মারফৎ খবর দিয়ে গোটা চার পাঁচ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন তার বাবা। ছোট ভাই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, তার ওষুধের দামটা বাকি পড়েছে ডাক্তারখানায়। অরুণ যে এক বড়লোকের বাড়ি কাজ পেয়েছে আর তাদের সুনজরে পড়েছে এ খবর তিনি আগে পেয়েছিলেন।

মাস কয়েক বাদে ফল বেরুলো পরীক্ষার। দেখা গেল, পুরুষের নাম ডোবালেও মফঃস্বলের সেই অখ্যাত কলেজটির নাম অরুণ গেজেটের মাথার দিকে তুলে ধরতে পেরেছে। প্রথম হয়েছে দর্শনে। এমন ভালো রেজাল্ট সে কলেজের ইতিহাসে নাকি আর দেখা যায় নি। অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে বিভাসও এসে কাঁধ চাপড়ে দিল অরুণের, বলল, 'না হে, সেদিনের সেই কথাটা একটু এ্যামেণ্ড

করে নিচ্ছি অরুণ। হৃদয় ভাঙলেও যার কলম ভাঙে না কাপুরুষ হলেও ছেলে হিসাবে তাকে ভালো না বলে জো নেই।'

কিন্তু এ সান্ত্বনায় কি বুক ভরে? এই ভালোত্ব দিয়ে কি ভুলিয়ে রাখা যায় মন!

গেজেটের মাথার দিকে নিজের নাম ছাপা হলেই কি জীবনের সব ক্ষোভ সব দুঃখ সব লজ্জা চাপা পড়ে যায়?

কলকাতায় এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল অরুণ। আস্তানা নিল উত্তর কলকাতার একটি জনবহুল সস্তা মেসে। ফের বসল বইপত্র নিয়ে, কিন্তু বইতে কিছুতেই মন বসতে চাইল না। বিরাট শহর, বিচিত্র লোকজন, বিচিত্রতর সহপাঠী সহাধ্যায়িনীরা, কিন্তু কোন কিছুই আকর্ষণ করতে পারল না অরুণকে, সব ছাড়িয়ে তার মন কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল মফঃস্বল শহরের একখানি দক্ষিণ-খোলা ঘরে যেখানে রোজ সকাল সন্ধ্যায় দেখা হত একটি স্মিতমুখী অপরূপদর্শনার সঙ্গে।

বিভাসের ছোট পিসীর বিয়ে হয়েছে জয়ন্তীর শ্বশুর বাড়ির পাশের গাঁয়ে। তিনি একদিন স্বামীর সঙ্গে চোখের চিকিৎসার জন্য এলেন কলকাতায়। বিভাস গেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে গেল অরুণ। কথায় কথায় জয়ন্তীদের খবর বললেন বিভাসের পিসীমা। জয়ন্তী মোটেই শান্তিতে নেই শ্বশুরবাড়িতে। কি করে বিয়ের আগের বিশ্রী সব কানাঘুষা অতিরঞ্জিত হয়ে কানে গিয়েছে জয়ন্তীর শ্বশুর আর শাশুড়ীর। উঠতে বসতে তাঁরা তাকে নানারকম বাঁকা বাঁকা কথা শোনাচ্ছেন। নবনীর মনও ভারি সন্দিগ্ধ। সর্বদা স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখতে চায়। অভদ্র ইঙ্গিত

করে যখন তখন। ভবেশবাবুব খুব অসুখ। তবু অসুস্থ বাপকে একবাব দেখতে আসবার অনুমতি পায় নি জয়ন্তী।

ফেরবার পথে অরুণ বিভাসকে বলল, 'আমিই সব কিছুর জন্য দায়ী বিভাস। আমিই নষ্ট করে দিলুম একটা জীবনকে।'

বিভাস হেসে মাথা নাড়ল, 'দূর পাগল। অত সহজেই কি একটা জীবন নষ্ট হয়। কিছু নষ্ট করতে হলেও ক্ষমতার দরকার। তোমাব দ্বাবা তা হবে না। মন দিয়ে পড়াশুনো কবো। অন্য কোন দিকে মন দিয়ে তোমার কাজ নেই। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিভাস একটু সিনিক ধবনেব ছেলে। খোঁচা দিয়ে কথা বলা তার অভ্যাস। অরুণ মনে মনে হাসল। কোন কিছু নষ্ট করবাব নাকি তার ক্ষমতা নেই। না থাক্ না-ই রইল। সে রকম ক্ষমতা সে চায় না। কিন্তু কষ্ট করবার, কষ্ট পাবার ক্ষমতা তো আছে। আছে দুঃখবোধের, দুঃখ পাবাব অধিকার, জয়ন্তীর কাছে সে দুঃখের রূপ আলাদা, ধরন আলাদা কিন্তু কারণ তো একই। সেই ঐক্যের মধ্যে জয়ন্তীর সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য খুঁজে পেল অরুণ। নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা। অরুণ যদি শুনতে পেত জয়ন্তী বেশ সুখে আছে তা হলে হয়তো নিশ্চিন্ত হত, স্বস্তি পেত, কিন্তু দুঃখ আর বেদনার ভিতর দিয়ে এমন তীব্রতর অস্তিত্বের স্বাদ পেত না। দেখাসাক্ষাৎ, চিঠি-পত্রের যোগাযোগ না থাক, চিরকাল ধরে দু জনের যোগসূত্র রক্ষা করার এই দুঃখ। এই অস্বস্তি আর শান্তিহীনতা।

যথাসময়ে মৃত্যুর খবর এল ভবেশবাবুর। কি একটা খারাপ জ্বরে ভুগে ভুগে মারা গেছেন। বহু জোর জবরদস্তি করে বাপকে

শেষ মুহূর্তে দেখতে এসেছিল জয়ন্তী। কিন্তু দেখা হয় নি। জয়ন্তী এসে পৌঁছবার আগেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অরুণ ভাবল এবার একখানি চিঠি লিখবে জয়ন্তীকে। কিন্তু লিখতে গিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। কি লিখবে ঠিক পেল না; যা লিখল মনঃপূত হল না। ছিঁড়ে ফেলল চিঠি।

এম. এ. তে আশানুরূপ ফল হল না। তবু বন্ধুরা ধরে বসল, 'খাওয়াতে হবে। অদ্বিতীয় না হয়ে না হয় দ্বিতীয় হয়েছ। কিন্তু আমরা যে প্রায়ই সব তৃতীয় শ্রেণীর। মিষ্টিমুখ ছাড়া আমাদের সান্ত্বনা কিসে।'

ট্যুইশনের টাকায় মেসের ঘরে ঘরোয়া ধরনের ছোট একটু ভোজসভা বসল। সবাই এসে পৌঁছল। কিন্তু বিভাস আর আসে না। শেষ পর্যন্ত দেখা মিলল বিভাসের। রাত তখন ন'টা। সবাই রুখে উঠে বলল, 'এত দেরি হল যে, খবর কি তোমার?'

অরুণকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বিভাস বলল, 'খবর খুব সুবিধা নয়। নবনী মারা গেছে কলেরায়। সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিল শ্বশুরবাড়িতে। সেইখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। টেলিগ্রাম পেয়ে অনুকূলদা আজই রওনা হয়ে গেলেন। তাঁকে স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েই দেরী হল এতখানি।'

পরমুহূর্তে ভোজের আসরে ফিরে এল বিভাস। সমানে চালাতে লাগল গল্পগুজব আর চপ কাটলেট। একেবারে নির্বিকার চিত্ত, যেন কিছুই ঘটে নি। কিন্তু অরুণ রইল নির্বাক, স্তব্ধ হয়ে। তার বৈকল্য বুঝি কিছুতেই আর ঘুচবে না।

আরো খবর এসে পৌঁছল নানা রকমের। জয়ন্তীর শ্বশুর

পুত্রশোকে পাগলের মত হয়ে যা তা ।।লছেন। অসময়ে এই যে অপমৃত্যু হয়েছে নবনীর, তা নাকি জয়ন্তীরই পাপে। তাতে নাকি জয়ন্তীর হাত আছে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয় নবনীর। জয়ন্তীকে তাঁরা ফিরিয়ে নেন নি কিন্তু ছিনিয়ে নিয়েছেন তার সমস্ত অলঙ্কার আসবাবপত্র। দাবী করেছেন নবনীর লাইফ ইনসিওরেন্সের পাঁচ হাজার টাকা। জয়ন্তী স্বেচ্ছায় লিখে দিয়েছে তার স্বত্ব।

এবার স্তব্ধতা ভাঙল অরুণেব, কাটিয়ে উঠল সমস্ত দ্বিধা আর ভীরুতা। সরাসরি চিঠি লিখল জয়ন্তীকে। লিখল, 'তোমার দু বছর আগেকার চিঠির জবাব আজ দিতে বসেছি জয়ন্তী। আজ নয়, দু বছর ধরেই তোমার চিঠির জবাব দিতে চেষ্টা কবেছি। লিখেছি আর ছিঁড়েছি, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছি নিজেকে। ছিঁড়েছি সেদিনের সেই ক্লীব কাপুরুষকে। সেদিন আমাব ভুল হয়েছিল। আজ আমাকে সেই ভুলের সংশোধন করতে দাও জয়ন্তী। জানি এই মুহূর্তে আমার আওড়ানো উচিত মোহমুদ্গর। তা আমি পারব না, কি করে পারব। আমার মন এখনো মোহে আচ্ছন্ন। সে মোহ জীবনের, সে মোহ তোমার। রূপ-রস-ভালোবাসা-ভরা পৃথিবীর।'

এইসব আরো অনেক কথা লিখেছিল অরুণ। তার কলমের কোন রাশ ছিল না। লিখেছিল, এই দু বছর ধরে যা ঘটে গেছে তা শুধু দুর্ঘটনা, তা শুধু দুঃস্বপ্ন কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নকে যে চিরকাল সত্য বলে, বাস্তব বলে মেনে নিতে হবে তার কি কথা আছে। কোন ঘটনাকে আজ তারা মেনে নেবে না, অন্তরের জোরে ভালোবাসার জোরে ঘটনাকে তারা ঘটিয়ে নেবে। অবশ্য বিত্ত

সম্পদ কিছু নেই অরুণের বরং অনেকগুলি ভাই বোনের দায়িত্ব আছে ঘাড়ে। সেই সঙ্গে দায়িত্ব নেবে সে জয়ন্তীরও। দারিদ্র্যের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়। দারিদ্র্যকে সে ভয় করে না। চিত্তের তেমন দৃঢ়তা জয়ন্তীরও নিশ্চই আছে। অরুণের বাবা অবশ্য গোঁড়া সেকেলে ব্রাহ্মণ। নানা সংস্কারে তাঁর মন আচ্ছন্ন। বিধবা-বিয়েতে তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন সে আশঙ্কা আছে। কিন্তু জয়ন্তী সঙ্গে থাকলে সমস্ত বাধাবিঘ্নকেই জয় করতে পারবে অরুণ। কিছুতেই আর পিছু-পা হবে না। তারপর লিখল্, জয়ন্তীর সঙ্গে সে সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করছে। আরো অনেক বক্তব্য আছে তার। যে সব কথা মুখোমুখি ছাড়া বলা যায় না।

সপ্তাহখানেক বাদে জবাব এল জয়ন্তীর। সংক্ষেপে সম্মতি জানিয়েছে সে সাক্ষাতের।

উল্লাসে, আনন্দে, উত্তেজনায় ভরে উঠল অরুণের বুক। মন উঠল অধীর আর উন্মুখ হয়ে। গাড়ির একটা রাত্রি যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। ভোর ভোর সময়ে পৌঁছল সেই শহরে। অতীতের সুখস্মৃতির সেই শহর। কিন্তু অতীত আজ বর্তমানে রূপ ধরেছে, স্মৃতি হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

দু ধারে ঝাউগাছের সার। মাঝখান দিয়ে লাল সুড়কি ঢালা পথ। দিগন্তে যে ভোরের সূর্য উঠেছে, উঠেছে লাল হয়ে তা অরুণের আনন্দের রঙে রঙীন। সদ্য জাগ্রত সুন্দর মফঃস্বল সহরের জনবিরল কয়েকটি আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে সেই অতি পরিচিত সাদা ধবধবে বাড়িটির সামনে দুরু দুরু বুকে এসে দাঁড়াল অরুণ। দেখা হল জয়ন্তীর বড় দাদা অনুকূলের সঙ্গে। প্রাতর্ভ্রমণ শেষ

করে বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে সাত আট বছরের একটি সুদর্শন ছেলে। অরুণকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, 'কি চাই ?'

'দেখা করতে চাই জয়ন্তীর সঙ্গে।' নির্ভীক জড়তাহীন স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল অরুণ। এই একটি দিনের মহড়া দিচ্ছে সে ক' দিন ধরে।

অনুকূলের মুখখানা মুহূর্তের জন্য টকটকে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তে আত্মসংবরণ করে সহজ শান্ত সুরে তিনি বললেন, 'বেশ। আমি খবর পাঠাচ্ছি জয়ন্তীকে। যদি সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় আমার আপত্তি নেই।'

ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন অনুকূল, 'যাও, তোমার ছোট পিসীর কাছে গিয়ে বলো, অরুণবাবু নামে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।'

মুন্সেফী থেকে সাবজজীতে প্রমোশন পেয়েছিলেন অনুকূলবাবু। নৈতিক পবিত্রতায় যেমন তাঁর বিশ্বাস ছিল তেমনি ছিল নারী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে। পৈতৃক সনাতন হিন্দুসংস্কারের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিষ্টাচার।

খবর এল জয়ন্তী প্রতীক্ষা করছে অরুণের জন্য। বাড়ির সেই ভিড় আর নেই। ভবেশবাবু মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ছোট ছোট পরিবারে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে যার যার চাকুরির জায়গায়। মা গেছেন মেজ ছেলের সঙ্গে। পুত্রবধূ আসন্নপ্রসবা। তাঁর সহায়তা চাই। জয়ন্তী আছে অনুকূলের তত্ত্বাবধানে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলার সেই দক্ষিণ-খোলা ঘরখানিতে গিয়ে

পৌঁছল অরুণ। ভবেশবাবুর সেই ঘর। সব প্রায় তেমনিই আছে। সেই টেবিল, চেয়ার, পালঙ্ক। চারদিকে বইভরা কাঁচের আলমারী। জানলার নিচে সেই শস্যশ্যামলা মাঠ। দিগন্তে ঝাউ আর দেবদারু। কেবল নেই ভবেশবাবু, কিন্তু তাঁর কথা সেই মুহূর্তে মনে পড়ছিল না অরুণের। তার সমগ্র অস্তিত্ব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল কেবল একজনের জন্য।

একটু বাদে পাশের দরজার পাট ঠেলে ঘরে ঢুকল জয়ন্তী। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে অরুণ নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে গেল, ভবেশবাবুর মত সেও যেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। রঙীন শাড়িতে কাঁকনে হারে প্রবালের দুলে যে অপরূপ সুন্দরী একটী তন্বী কিশোরীর স্মৃতি মনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছিল অরুণের, এই মেয়েটির সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই। খাটো আর মোটা সাদা থান তার পরনে। গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নটুকুও নেই। চোখে মুখে শীর্ণ কাঠিন্য। অন্তরের শুষ্ক শূন্যতা সমস্ত চেহারায় ফুটে উঠেছে। একটা অব্যক্ত হাহাকারে ভরে উঠল অরুণের মন। মহড়া-দেওয়া কথাগুলি মুখে এল না। জয়ন্তীই প্রথমে কথা বলল, 'কেন এসেছ? কি চাই তোমার?'

অরুণ বলল, 'কি যে চাই, তা তোমার অজানা নেই জয়ন্তী। আমার চিঠির জবাব এখন পর্যন্ত তো পাই নি। আমি তার প্রতীক্ষা করছি।'

জয়ন্তী অদ্ভুত একটু হাসল, 'প্রতীক্ষা করছিলাম আমিও। তোমার চিঠির জবাব সত্যিই দেওয়া দরকার। আর সে জবাব মুখোমুখি না দিলে তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না।'

দেরাজ টেনে বের করল জয়ন্তী অরুণের লেখা সেই দীর্ঘ চিঠিখানা। বের করল একটা মোমবাতি আর দেশলাই। তারপর সেই দীপের শিখায় ধরল চিঠিখানা। সম্বোধন থেকে স্বাক্ষরটুকু পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পুড়ল জয়ন্তী, পুড়ল অরুণ।

জয়ন্তী বলল, 'এই তোমার চিঠির জবাব। হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ের বিয়ে একবারই হয়। আর যেন আমাকে চিঠি লিখবার স্পর্ধা তোমার না হয় কোনদিন।'

স্পর্ধা! একি বলছে জয়ন্তী। না, অরুণ-ই ভুল শুনেছে! এগিয়ে এসে অরুণ এবার হাতখানা ধরে বসল জয়ন্তীর, বলল, 'তুমি ভাল করে ভেবে দেখ, ভাল করে বুঝে দেখ জয়ন্তী।'

হাতখানা ছাড়িয়ে নিল না জয়ন্তী, শুধু জ্বলন্ত চোখে তাকাল অরুণের দিকে, বলল, 'ভেবেছিলাম সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞান তুমি হারাও নি, ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলে দারোয়ান সঙ্গে রাখবার দরকার হবে না। কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। এবার বোধ হয় তাকে ডাকবার সময় হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীর হাতখানা ছেড়ে দিল অরুণ। যেন সাপে ছোবল মেরেছে। বিষের ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বাঙ্গে।

'আমার স্বামীকে বোধ হয় তুমি দেখ নি।' অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'তিনি ছিলেন মহৎ, সুন্দর, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, সত্যিকারের আদর্শ পুরুষ ছিলেন তিনি। তোমার মত কাপুরুষ ছিলেন না।'

অরুণ যে পরিচয় শুনেছিল নবনীর, তার সঙ্গে জয়ন্তীর স্বামীর মিল নেই।

কিন্তু জয়ন্তী আবার বলল, 'তুমি বোধ হয় কোনদিন তাঁকে দেখ নি তাই তোমার এ দুঃসাহস হয়েছিল।'

অরুণ বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, সে বার তোমাদের বিয়ের পর দূর থেকে আমি সেদিন দেখেছিলাম নবনীবাবুকে।'

জয়ন্তী অদ্ভুত একটু হাসল, 'কিন্তু কাছ থেকে তো দেখ নি। তা হলে অন্যরকম দেখতে। দেখবে আজ কাছ থেকে?'

অরুণ অবাক হয়ে গেল। জয়ন্তী কি প্রকৃতিস্থ নেই? স্বামীর শোকে তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মৃত নবনীকে সে কেমন করে দেখাবে?

কিন্তু জয়ন্তী বলল, 'দেখবে তো এসো। পাশের ঘরেই তিনি রয়েছেন।' জয়ন্তীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি সম্বন্ধে অরুণের আর সন্দেহ রইল না। তবু উপেক্ষা করতে পারল না তার ডাক। চলল পিছনে পিছনে।

গিয়ে দেখল পাশের ছোট্ট ঘরটিতে নবনীর বাঁধানো অয়েলপেন্টিং। সবল সুদীর্ঘ দেহ। সর্বাঙ্গে শৌর্যের দৃঢ়তা, চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। স্নেহময় প্রেমময় অপূর্ব সুন্দর এক যুবকের প্রতিকৃতি। অরুণের যতটা মনে পড়ল এতখানি সুপুরুষ ছিল না নবনী। প্রেম, বুদ্ধির, ক্ষমার এমন সমন্বয় ছিল না তার আকৃতি-প্রকৃতিতে, তার জীবনে। অরুণ লক্ষ্য করল নবনীর প্রতিকৃতির চারদিক ঘিরে রয়েছে সদ্য-গাঁথা গন্ধরাজের মালা। শুধু তাই নয়, সামনে আসন পাতা রয়েছে। এক পাশে সাজানো রয়েছে একরাশ ফুল আর শ্বেতচন্দন। সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে আর এক পাশে।

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না অরুণের। চিনতে বাকি

রইল না জয়ন্তীর স্বামীকে। সে তো শুধু নবনী নয়, সে জয়ন্তীর স্বামী। স্বামীত্বের আদর্শ রূপ। অরুণ বুঝতে পারল, মরে নবজন্ম নিয়েছে নবনী জয়ন্তীর মনে, মৃত্যু তাকে অমৃতত্ব দিয়েছে। মরলোকের মানুষ নবনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত অরুণ, কিন্তু জয়ন্তীর মনোলোকের মানস-নবনীর কাছে সে একেবারে নিরস্ত্র, নিঃসহায়।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ। কোন কথাই আর বলল না জয়ন্তীকে। বলবার কিইবা ছিল। কিংবা অনেক কথাই হয়ত ছিল বলবার, কিন্তু বলে কোন লাভ ছিল না।

দোরের কাছে ফের দেখা হল অনুকূলবাবুর সঙ্গে। চুরুট মুখে পায়চারি করছেন। বললেন, 'কথাবার্তা শেষ হল আপনাদের?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, শেষ হল।'

অসিতবাবু থেমে ফের সিগারেট ধরালেন। তারপর চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম অসিতবাবুকে। সাধারণ চেহারার মোটামুটি সুদর্শন শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। এর আগেও অনেকবার দেখেছি। কিন্তু এমন করে আর দেখি নি। তাঁর রূপের সঙ্গে যেন আজ নিগূঢ় এক রহস্যের সংযোগ ঘটেছে।

একটু পরে বললুম, 'কিন্তু গল্প তো আপনার ওখানেই সত্যি সত্যি শেষ হল না। তারপর কি হল বলুন।'

অসিতবাবু ছাইদানিতে খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেললেন। তারপর একটু হেসে ফের সুরু করলেন, 'তারপর আবার কি হবে।

যেমন হয়। কিছুদিন দাম্ভে নৈরাশ্যে ঘোরাঘুরিতে, ছুটোছুটিতে কাটল। উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলতে লাগল হৃৎপিণ্ড। অরুণ ভাবল চিরদিন বুঝি এমন করে জ্বলতেই থাকবে। জ্বালার বুঝি কোনদিন বিরাম হবে না। কোনদিন নিববে না সেই জ্বলন্ত দুঃখানল। কোনদিন ভুলতে পারবে না জীবনের এই কটি দিনকে। বছর কয়েক পরে অবশ্য ভুল ভেঙেছিল অরুণের। বুঝতে পেরেছিল জীবনে এসব বৃত্তান্ত ভোলাটাই সহজ, মনে রাখাই অত্যন্ত কঠিন। মনে রাখতে চাইলেই কি মনে রাখা চায়! জীবনের আরো অনেক দাবী আছে, দায়িত্ব আছে, প্রয়োজন আছে, তাদের স্বীকার না করে জো থাকবে না। ভুলবার জন্য পালালো অরুণ বাংলার বাইরে। সুদূর পশ্চিমে নিল এক প্রফেসারী। কিন্তু বাংলার বাইরেও তো বাঙালিনীর আজকাল অভাব নেই। আর গায়ে গেরুয়া পরলেই কি মনের কাঙালপনা অত সহজে মেটে? দ্বারে দ্বারে হাত পাতবার অভ্যাস যায় সহজে? বছর তিন চার পরে হাত পেতে যে মেয়েটির পাণিগ্রহণ করল অরুণ সে মেয়েটিও দেখতে সুশ্রী, শুনতে সুকণ্ঠী, সদালাপী, সুশিক্ষিতা। এঁরও একটি নাম চাই নাকি আপনার, কল্যাণবাবু?'

নিস্পৃহভাবে বললুম, 'দিন না, ক্ষতি কি।'

অসিতবাবু বললেন, 'ঈস্, আপনার সমস্ত কৌতূহল মাটি করে ফেললুম বলে মনে হচ্ছে। কৌতূহল না থাকুক শুনে একটু কৌতুক হয়তো বোধ করতে পারেন আপনি, তাই বলছি। অরুণের স্ত্রীর নাম কল্যাণময়ী। বাপ একটু সেকেলে ধরনের প্রবাসী বাঙালী। কাজ করেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে, রুচির মধ্যে

একটু পু[illegible] ছাপ আছে, তাঁর রুচির ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারল না অরুণ, কিন্তু কন্যার ওপর ফেলল। গড়ে-পিটে পুরোপুরি এ-কালিনী করে তুলল তাকে। নামটাকে ছেটে কেটে করল কলি। তারপর চলে এল কলকাতায়। পরমার্থতত্ত্বের অধ্যাপনা করতে করতে কিছু বেশি মাইনে পেয়ে চাকরি নিল ইনকাম ট্যাক্স্ অফিসে। পরমার্থের চেয়ে বড় চরমার্থ, তারপর সেখান থেকে আরো দু একটা অফিস অদল-বদল হল। বয়ে চলল সময়ের স্রোত। মন্বন্তরে, যুদ্ধে, দাঙ্গায় রাঙা হল শহর। তারপর সেই রঙ ফের ফিকে হয়ে এল, কিছু বা ধুয়ে গেল চোখের জলে, কিছু কলের জলে, কিছু বা ঢাকা পড়ল ধুলোয়, কিছু শুকিয়ে গেল, একটু একটু করে লোকে সব ভুলতে লাগল। ভোলার চেয়ে মনে রাখা ঢের কঠিন। জীবন-সংগ্রাম কঠিনতর। তার স্বাদ পুরোপুরিই পেতে হচ্ছিল অরুণকে। ভাই-বোনদের সংখ্যা আর বাড়ে নি। কিন্তু তাদের ভাইপো ভাইঝিরা একটি দুটি আসতে সুরু করেছে। আয় বৃদ্ধি সেই অনুপাতে অনেক রয়েছে পিছিয়ে।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে শু ছেড়ে স্যাণ্ডাল পরল অরুণ, স্যুট ছেড়ে লুঙ্গি। তারপর পুরোনো ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে স্ত্রীর দেওয়া চায়ের কাপটি হাতে নিতে যাবে এমন সময় পরিতোষ এসে উপস্থিত। পরিতোষ পুরোনো সহকর্মী বন্ধু। ঠিক সহকর্মী নয়, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট-সহায়ক। পদটা অরুণের চেয়ে একধাপ নিচেই। তবে বয়সও কম। পরে উন্নতি করতে পারবে। পরিতোষ এসে ধরল তার বিয়েতে বরযাত্রী যেতে হবে। নিমন্ত্রণ পত্র অবশ্য আগেই

দিয়েছিল। এবার পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি সংশোধন করতে এসেছে।

অরুণ বলল, 'ক্ষেপেছো। একবার বর হয়েছি তাই যথেষ্ট। যাত্রী-টাত্রী হয়ে ভারি হাঙ্গামা। তার চেয়ে দূর থেকে আশীর্বাদ করছি।'

কিন্তু পরিতোষ নাছোড়বান্দা। সে শরণ নিল অরুণের স্ত্রীর। মনিবপত্নীকে দু এক রাত সিনেমা দেখিয়ে সে প্রায় হাত করে ফেলেছিল।

কল্যাণী (কলি আর কল্যাণময়ীর মাধ্যমিক রূপ) বলল, 'না এ বড় অন্যায়। তুমি দিনের পর দিন ক্রমেই কুণো হয়ে যাচ্ছ। সমাজ সামাজিকতা অমন করে ছেড়ে দিলে চলবে কেন। বিশেষ করে পরিতোষ ঠাকুরপোর বিয়ে। না গেলে কি ভালো দেখায়। তিনি কত করেন আমাদের জন্যে।'

অগত্যা উঠতেই হল। যাবে বরযাত্রী, কিন্তু অরুণকে জোর জবরদস্তি করে প্রায় বরবেশ পরিয়েই ছাড়ল কল্যাণী। বিয়েটা বিশেষ করে মেয়েদেরই উৎসব। বিয়ের নাম শুনলেই মন নেচে ওঠে তাদের। সে বিয়ে নিজেরই হোক আর পরেরই হোক। আত্ম-পরে এখানে প্রভেদ নেই।

বিবাহবাসর বড়িশায়। এতকাল কলকাতায় থেকে ও জায়গাটার কেবল নামই শুনেছে অরুণ, যাওয়ার কোন উপলক্ষ ঘটে নি। এবার ঘটল। কথা ছিল বরের মোটরেই ঠাঁই হবে। কেন না অরুণ সম্ভ্রান্ত অতিথি। কিন্তু পরিতোষের বাড়িতে গিয়ে দেখল গাড়িতে তার ভাইপো ভাগ্নের দল উঠে বসেছে। তারা

কিছুতেই নামবে না। সম্ভ্রান্ত অতিথির জন্যও না। অরুণ হেসে তাদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলে আর পাঁচসাত জন বয়স্ক সহযাত্রীর সঙ্গে শ্যামবাজারের মোড় থেকে তিনের-এ বাস ধরল।

বাসের মধ্যে আলাপ হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। পবিতোষের কি রকম ঠাকুরদা হন সম্পর্কে। অবশ্য বয়সটা ঠাকুরদা-জনোচিত নয়, কিন্তু সম্পর্কোচিত রসিকতা বেশ আছে।

তিনি বললেন, 'ভিড়ে তো গলে যাচ্ছি মশাই, কিন্তু লাভ কতটুকু কি হবে তাতে ঘোর সন্দেহ আছে।'

অরুণ বলল, 'কেন?'

তিনি বললেন, 'আমরা তো ইতর জন। মিষ্টান্ন ছাড়া তো আর কিছু নেই বরাদ্দে। কিন্তু ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা যা দেখছি তাতে সেটুকুও জোটে কিনা সন্দেহ।'

অরুণ বলল, 'কেন?'

ঠাকুরদা বললেন, 'আরে মশাই বিয়ে কার জানেন? বিধবার। বিয়ে-চূড়োয়, কোন শুভ কাজে যে হাত ছোঁয়ালে মহাভারত পর্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যায়, অধিবাস-টাস নয় তার একেবারে সাক্ষাৎ বিয়ে? বলুন দেখি কি কাণ্ড? গোড়াতেই অযাত্রা। মিষ্টিমুখ নয় মিষ্টিকথা শুনেই এ যাত্রা বিদায় নিতে হবে। আমি আপনাকে বলে রাখলুম।'

অরুণ একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'পবিতোষ কি বিধবা বিয়ে করছে নাকি? কই আমাকে তো আগে বলে নি।'

ঠাকুরদা বললেন, 'আমাকেই কি আগে বলেছে? পরে শুনলুম। আগে থেকেই নাকি এক-আধটু জানা শোনা ছিল।

তা জেনেই হোক না জেনেই হোক নেমন্তন্ন যখন নিয়েছি জাতটা সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। এখন যদি পেটটা না ভরে তো দু কূলই গেল।'

আবহাওয়াটা ভালো নয়। কৃষ্ণপক্ষের মেঘলা আকাশ। শহর ছাড়িয়ে শহরতলীতে পড়ল অরুণরা! সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও পড়তে সুরু করল ফোঁটায় ফোঁটায়। মনে মনে ভারি বিরক্ত হয়ে উঠল অরুণ। আচ্ছা স্থান কাল পাত্রী ঠিক করেছে পরিতোষ। এ তো আসলে বিয়ে নয়, বিয়ের মোড়কে সমাজ-সংস্কার।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটতে হয় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। কন্যাপক্ষ থেকে দু একটি ছাতার যা সরবরাহ হয়েছে তার তলায় গেলে অংশতঃ ভিজতে হয়। তার চেয়ে একক পুরোপুরি ভেজাই ভালো। এর আগে লজ্জা করছিল, কল্যাণীর পুরোনো বিশেষ বেশবাসটির জন্য এবার দুঃখ হল অরুণের।

অবশেষে সদলবলে এসে পৌঁছানো গেল বিয়ে-বাসরে। জীর্ণ একটা দোতলা বাড়ি আব সামনে পানাভরা মজা পুকুর ইলেকট্রিকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তবু অরুণরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোনো বাড়ির ভিতর থেকে হুলুধ্বনি উঠল, বেজে উঠল শাঁখ। •অমন প্রতিকূল পরিবেশেও খুশির আমেজ লাগল অরুণের মনে।

টাক-পড়া প্রৌঢ় কন্যাকর্তা এগিয়ে এলেন, 'আসুন, আসুন, আপনাদের খুবই কষ্ট হল।'

পরিতোষের সেই ঠাকুরদা বললেন, 'আজ্ঞে তা আপনাদের কৃপায় একটু হল বই কি।'

কন্যাকর্তা হয়তো একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। জবাবটা

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক মুখে জোগাল না, কিন্তু জবাব এল তাঁর পিছন থেকে। কেবল বিনীত নয়, মধু-বিনিন্দিতকণ্ঠে, 'একটু কেন, কষ্ট আপনাদের যথেষ্টই হয়েছে। গরীবের মেয়ের বিয়ে। কষ্টের কথা তো আপনারা জেনে-শুনেই দয়া করে এসেছেন। কৃপা আপনাদের, আমার কৃপার্থী।'

চমকে উঠে সেই সুধাকণ্ঠের অধিকারিণীর দিকে চোখ তুলে তাকাল অরুণ। তারপর আর চোখ নামাতে পারল না। জয়ন্তী, বেশবাসের তেমন পরিবর্তন হয় নি। সেদিনের প্রায় তেমনি একখানা সাদা থান পরনে। হয়তো ততখানি স্থূল আর হ্রস্ব নয়। তেমনি নিরাভরণ দেহ।

কিন্তু অদ্ভুত বদল হয়েছে চেহারার। সেদিনের সেই শুষ্কতা, শীর্ণতা, শূন্যতার বদলে পরিপূর্ণতা, স্বাস্থ্যে আর লাবণ্যে টল্‌টল্‌ করছে মুখ, জ্বলজ্বল করছে, তৃপ্তিতে আনন্দে।

অরুণকে দেখে একটু যেন চমকে উঠল জয়ন্তী, কিন্তু পরমুহূর্তে তার স্মিতমুখ ঠিক তেমনি সহজ হয়ে উঠল স্বাচ্ছন্দ্যে।

কন্যাকর্তা বিভূতিবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'তরঙ্গিনী নারী-কল্যাণ সমিতির সম্পাদিকা। এঁরাই উদ্যোগ আয়োজন করে বিয়ে দিচ্ছেন আমাদের রেবার। এঁদের সমিতিরই সভ্যা কিনা সে। তারপর অরুণকে দেখিয়ে বললেন, আর উনি আমাদের পরিতোষের বন্ধু। নাম—নাম—'

জয়ন্তী মৃদু একটু হাসল, 'নাম আমি জানি বিভূতিবাবু। আমাদের পরিচয় আছে।'

দুখানা হাত জোড় করে নমস্কার জানাল জয়ন্তী। যেন একটি

মুদ্রিত শ্বেতপদ্ম এসে মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করল তার শুভ্র, সুন্দর কপালটুকু।

একটু বাদে জয়ন্তী বলল, 'ভালোই হল, রেবার বিয়েতে বিভাসদাকেও পেয়েছি আমরা দলে। খুলনা থেকে আজই এসে পৌঁছেছেন তিনি। ভাগ্যে স্টেশনে গিয়েছিলাম। তাই দেখা। জোর করে ধরে এনেছি। ঘুমুচ্ছেন শুয়ে শুয়ে। আগের দু রাত নাকি ঘুমোন নি। আজ সন্ধ্যা থেকেই তার শোধ তুলছেন। ডেকে দেব?'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল অরুণ। তারপর দলের সঙ্গে গিয়ে বসল বরযাত্রীদের আসরে। ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পালাতে চেষ্টা করল অরুণ, কিন্তু ভিড় তাকে স্পর্শ করল না। চাপা-দেওয়া ক্ষতের মুখে যেন নতুন করে আবার খোঁচা লেগেছে। জ্বালা ধরেছে পুরোনো দিনের মত। হতাশার জ্বালা, অপমানের জ্বালা, ব্যর্থতার জ্বালা। তার শোধ নেওয়া হয় নি। সেই সঙ্গে অবাকও লাগছে একটু একটু। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কৌতুককরও বটে। সেই স্বামী-পূজারিণী জয়ন্তী হয়েছে নারীকল্যাণ সঙ্ঘের সম্পাদিকা, বিধবা-বিয়ে হচ্ছে তারই উদ্যোগে যে সে দিন দম্ভভরে বলেছিল হিন্দুর মেয়ের মাত্র একবারই বিয়ে হয়। হাতখানা ধরেছিল বলে যে দারোয়ান লেলিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল তাকে। আর একবার সহনাতীত জ্বালা করে উঠল সেই গোপন ক্ষতদেশে। স্থান কাল সব যেন ভুলে গেল অরুণ, ব্যবধান ভুলে গেল আট ন বছরের। ভাবল, এখান থেকে উঠে গেলে কেমন হয়। যেখানে জয়ন্তী আছে সেখানে সে থাকবে কেমন করে।

বিয়ের লগ্নের দেরি আছে। তার আগে বরযাত্রীদের

আপ্যায়ন-পর্বটা হয়ে যাক। কারণ আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ফের তো ফিরে যেতে হবে। কন্যাকর্তা এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। পরিতোষের ঠাকুরদা অরুণের কানে কানে বললেন, 'চলুন মশাই, চলুন। আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। হিতৈষিণীদের ধন্যবাদ। এই দুর্যোগের মধ্যেও জলযোগের ব্যবস্থাটা ওঁরা বহাল রেখেছেন।' তারপর আর একটু চাপা গলায় বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন, মিষ্টিমুখ না হলেও বোধ হয় তত আর আপসোস ছিল না। চোখ জুড়িয়ে গেছে মশাই, হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ। হিতৈষিণীর মনোহারী মুখ আরো সুদুর্লভ।'

ভিতরবাড়ি থেকে বিভাস এসে পৌছল। সোল্লাসে জড়িয়ে ধরল অরুণের হাত, 'আরে তুমি? আমি তো ভেবেছিলাম মরে হেজে একেবারে ভূত হয়ে গেছ। কত মারাত্মক কাণ্ডই তো ঘটল।'

অরুণ একটু হাসল, 'তুমিও তো ভূত হও নি দেখছি।'

বিভাস বলল, 'কে বলল যে হই নি। ভূতেরাও দেখতে প্রায় মানুষের মত। দেখবার অভ্যাস না থাকলে চেনা যায় না। বিয়ে-থা করে একবারে দারুভূত মুরারী সেজে বসে আছি। তেমন ছুটোছুটি আর করতে পারি নে। দেখছ না, বেশ একটু নেয়াপাতি ভুঁড়ির মত হয়েছে। ভালো খেয়ে-দেয়ে নয়, যা-তা খেয়ে খেয়ে। বদহজম। তার পর, তোমার খবর কি?'

কন্যাকর্তা ইতিমধ্যে আর একবার এসে হাতজোড় করে অরুণের সামনে দাঁড়ালেন। সহকারী বরকর্তা—পরিতোষের সেই ছোটদার বয়সী ঠাকুরদা ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হয়ে টানলেন হাত ধরে। অরুণ দু জনকেই এক কথায় জবাব দিল, 'মাপ করুন।'

কাজের এক ফাঁকে কখন জয়ন্তী এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওঁর জন্ত ব্যস্ত হবেন না বিভূতিবাবু। উনি না হয় একটু পরেই খাবেন।'

বিভূতিবাবু বললেন, 'কিন্তু একেবারে খাবেন না বলছেন যে।'

জয়ন্তী একটু হাসল, 'বলছেন নাকি? আচ্ছা সেজন্য ভাববেন না।'

লগ্ন এগিয়ে এসেছে। বিয়ের আয়োজন চলছে ভিতরে। জয়ন্তী আবার সেদিকে চলে গেল।

আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে, বোধ হয় জয়ন্তীদের সমিতিরই কোন সহকারিণী, টিপ্পনি কেটে বলল, 'আপনার যে আজ খুব উৎসাহ দেখছি জয়ন্তীদি। পুরোনো বন্ধুদের দেখা পেয়েছেন বলে বুঝি?'

জয়ন্তী ধমকের সুরে বলল, 'বাজে বকিস নে। আমার উৎসাহ কম দেখেছিস কবে? তোদের মত ঢিলেমি আমার কোনদিন নেই।'

কিন্তু ধমকের মধ্যে কৃত্রিমতা ধরা পড়ল। মাজা গৌর বর্ণের সুডৌল মুখখানিতে আরক্ত আভাস গোপন রইল না।

বৃষ্টি থেমেছে। সিগারেট ধরিয়ে বিভাসকে সেই পানাভরা পুকুরের ধারে ঠেলে নিয়ে গেল অরুণ। বলল, 'চল, একটু ঘুরে আসা যাক।'

বিভাস বলল, 'অবাক করলে। কোথায় যাবে এত রাত্রে এই কাদা কাচড়ের মধ্যে। তার চেয়ে বিয়ের আসরে গিয়ে বসলেই হত। খুব খুশী হত জয়ন্তী।'

অরুণ বলল, 'না না, চল। কথা আছে।'

বিভাস মুখ টিপে হাসল, বলল, 'বুঝেছি। এতক্ষণে তোমারও

তো বোঝা উচিত ছিল। তুমি একটা আস্ত হাঁদারাম। তোমার দোষ নেই। ভালো ছেলেরা তাই হয়। তারা খেলাটা বোঝে না, লীলাটাও নয়।'

তারপর সেই পানাভরা পুকুরের কাদামাখা পাড়ে পায়চারী করতে করতে বিভাসের মুখ থেকে অরুণ শুনতে লাগল জয়ন্তীর ইতিবৃত্ত, তার বিবর্তনের কাহিনী।

একনিষ্ঠ স্বামীপূজা বেশ কিছুদিন চলেছিল জয়ন্তীর। দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় কাটত তার স্বামীর ফটো নিয়ে সেই ছোট ঘরটুকুর মধ্যে। ফুল তুলত, মালা গাঁথত, মালা পরাত। অধ্যায়ের পর অধ্যায় বসে বসে পড়ত গীতা আর শ্রীমদ্‌ভাগবত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী তার বড়দা অনুকূল কোন কথা বলতেন না, কোন বাধা দিতেন না। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তিনি বদ্‌লী হয়ে গেলেন অন্য জেলায়। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে চাকরী খুইয়ে বাড়ি এসে বসলেন মেজদা শশাঙ্ক। চালানী ব্যবসা সুরু করলেন বাঁশের আর কাঠের। তিনি বললেন, 'পূজো করো করো, কিন্তু কেবল পূজো নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সংসারে কাজ আছে অনেক। তোমার মেজো বউদি চিররুগ্না। কতগুলি ছেলেমেয়ে। তাদের দিকে না চাইলে পারব কি করে।'

ফলে সকলের দিকেই চাইতে হল জয়ন্তীকে। গোশালা থেকে আঁতুড়ঘর পর্যন্ত। হাঁপ ছাড়বার সময় নেই। কিন্তু সময় না পেয়ে জয়ন্তী যেন বেঁচে গেল। বিয়ের আগের প্রণয়ঘটিত দুর্ঘটনায়, বিয়ের পরের বৈধব্যের দুর্ভাগ্যে যে সম্মান যে মর্যাদা সে হারিয়েছিল একটু একটু করে সেই হৃতশ্রী আবার ফিরে এল,

আবার সে হয়ে উঠল পরিবারের মধ্যে অপরিহার্য। পাড়ার যে সব মেয়েরা তার সঙ্গ এড়িয়ে চলত, মা-বাপের কাছ থেকে তারা ফের অনুমতি পেল জয়ন্তীর কাছে এসে সেলাই শিখতে। সূচিশিল্পে দক্ষতা ছিল জয়ন্তীর।

সেই সেলাই-সমিতি থেকেই উৎপত্তি নারীকল্যাণ সমিতির।

একদিন স্বামীর প্রতিকৃতির জন্য বেলফুলের মালা গাঁথতে বসছে জয়ন্তী, হঠাৎ পায়ের ওপর এসে ঘোষেদের কমলা বলল, 'দিদি আমাকে রক্ষা করো। ও আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চায়। নিয়ে গিয়ে এ বার একেবারে মেরে ফেলবে সেই মতলব।'

কমলাও বাপের বাড়িতে যখন থাকে সেলাই শেখে জয়ন্তীর কাছে এসে। তার দুর্ভাগ্যের কথা কারো অজানা ছিল না। কমলার স্বামী প্রিয়বর মদ্যপ, দুশ্চরিত্র। তাই নিয়ে কমলা কোন কথা বলতে গেলেই সে তার মুখ চেপে ধরে, গলা টিপে ধরে, লাথি মারে এলোপাথারি। বেদম মার খেয়ে সেদিন কোন রকমে পালিয়ে এসেছে কমলা। প্রিয়বর এসেছে পিছনে পিছনে। কেলেঙ্কারির ভয়ে কমলার বাবা তাকে সেই স্বামীর হাতেই সঁপে দিতে চাইছে। এখন জয়ন্তী যদি রক্ষা না করে উপায় নেই কমলার।

মালা-গাঁথা ফেলে রেখে উঠে পড়ল জয়ন্তী। মনে পড়ে গেল নিজের কথা। নিজেদের দাম্পত্য-জীবনের কথা। বলল, 'তোমার ভয় নেই কমলা, আমি যতক্ষণ আছি কেউ তোমাকে সেই দুর্বৃত্ত স্বামীর হাতে ঠেলে দিতে পারবে না।'

কথা দেওয়া যত সহজ হল, রক্ষা করা তত সহজ হল না। বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কমলার বাবা, কমলার স্বামী। এমন কি

জয়ন্তীর মেজদা শশাঙ্ক বললেন, 'যার যেমন স্বভাব তার তেমনি সঙ্গ। ও সব ন্যুইসেনসের জায়গা আমার এখানে হবে না। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওসব হিতব্রত, সমাজ-সংস্কার করতে পারো। আমার বাড়িতে চলবে না।'

জয়ন্তী বলল, 'বেশ। শ্বশুরবাড়ি আর তোমার বাড়ি ছাড়াও আরো অনেক বাড়ি আছে শহরে। দেখি তার কোনটি পাই কিনা।'

এক্‌জিবিশনে প্রাইজ পাওয়া নিজের যেসব সূচিশিল্পের নমুনা ছিল তার কাছে খুঁজেপেতে জড়ো করল জয়ন্তী, কুড়িয়ে নিল সঙ্গিনীদের হাতের কাজ, দু-চারখানা অলঙ্কার যা অবশিষ্ট ছিল বাঁধল আঁচলে, বিক্রি করে জমল কিছু টাকা। সেই টাকায় ভাড়া নিল কলেজ-পাড়ায় প্রফেসারের বাসার কাছে ছোট দোচালা একখানা টিনের ঘর। অফিস বসল নারীকল্যাণ সমিতির। ঘুরে ঘুরে সহায়তা পেল দু তিন জন পসারহীন তরুণ উকিলের। মামলা রুজু হল কমলার স্বামী প্রিয়বরের নামে, মারপিট অত্যাচারের অভিযোগে, খোরপোশের দাবীতে। আশ্চর্য, মামলা জিতে গেল জয়ন্তী। প্রাচীনপন্থীরা বাঁকা কটাক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র কোট করলেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' কিন্তু উৎসাহী তরুণের দল জয়ন্তীকে ঘিরে ধরল। দুর্নাম, অপবাদের ঢেউ কোন কোন পাড়ায় অবশ্য উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল। কেউ কেউ খুঁড়ে বের করলেন অতীতের ইতিবৃত্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ রুখতে পারল না জয়ন্তীকে। ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় সে ভেসে চলল। স্রোত তার অনুকূলে।

বিধবা বিয়ে সম্বন্ধে জয়ন্তীর দিন কয়েক একটু দ্বিধা ছিল। এ প্রসঙ্গে সে বলত, 'কেন, একজন পুরুষের স্কন্ধগত হওয়া ছাড়া

মেয়েদের কি অন্য কোন কাজ নেই? একজন মরে গেল বলে যে আর একজনের কাঁধে চাপতেই হবে তার কি মানে আছে। নিজেদের হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে মাথা আছে। চলবার পক্ষে, বাঁচবার পক্ষে তাই তো যথেষ্ট। গোঁফ দাড়ি নাই বা থাকল। তার ওপর এত লোভ কেন মেয়েদের।'

কিন্তু কিছুদিন বাদেই এই উগ্র নারীস্বাতন্ত্র্য শিথিল হয়েছিল জয়ন্তীর। সমিতির একটি অল্পবয়সী মুখচোরা লাজুক বিধবা মেয়ে তার ভারি স্নেহের পাত্রী ছিল। প্রমাণ পাওয়া গেল জজকোর্টের একটি সুদর্শন কেরাণীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছে। সবাই ভাবল মুখচোরা মিনতির এবার নাম কাটা যাবে সমিতি থেকে। কিন্তু কেরাণীটির অসীম সাহস। সে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করে বলল, 'নাম কাটেন কাটুন। কিন্তু আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা না হলে কান কাটা যাবে। মিনুর আর কোন জায়গায় স্থান হবে না। বলে কয়ে ওর বাপ-মাকে রাজী করাতেই হবে। আর তা কেবল আপনিই পারেন।'

জয়ন্তী একটা রাত সময় নিল ভেবে দেখবার। তারপর তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। হয় তো তার মনে পড়েছিল হাত পা নাক চোখ কান মাথার দিক থেকে মেয়ে আর পুরুষে আলাদা আলাদা হলেও হৃদয়ের ক্ষেত্রে দুই জাতই বড় অসহায়, বড় নির্ভরশীল পরস্পরের ওপর।

বিয়ের পরও মিনতির নাম রইল সমিতির খাতায় আর কর্ম-তালিকায় বিধবা বিয়েটিও অন্তর্ভুক্ত হল।

টিনের ঘরের বদলে পাকা বাড়ি উঠল সমিতির। বসল স্কুল,

বসল তাঁত, বাঁশের ফাজ, বেতের কাজ, ওই ধরণের আরো কয়েকটি লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবিত হল। সমিতির শাখা-অফিস বসল কলিকাতায়।

অনেকক্ষণ ধরে জয়ন্তীর দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী বলে গেল বিভাস। সে কাহিনীর মধ্যে অরুণের নামগন্ধ মাত্র নেই।

অরুণ মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবল এই মহাভারত শুনে তার লাভ হল কি। সময় নষ্ট করবার জন্য বিভাসের ওপর অদ্ভুত একটা আক্রোশই বরং এসে গেল তার।

অরুণ বলল, 'তা তোমার জয়ন্তী নিজেই আর কাউকে বিয়ে করল না কেন। একটা মহৎ দৃষ্টান্ত থেকে যেত সমিতিতে। অনুপ্রাণিত হত আরো অনেক শাখাসিঁদুরবঞ্চিতার দল।'

বিভাস একটু হাসল, 'এ প্রশ্ন কেবল তুমি নয়, আরো অনেকে করেছেন। তাদের মধ্যে প্রবীণ জজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সুরু করে তরুণ উকিল, প্রফেসার সবাই ছিলেন। কিন্তু জয়ন্তী তাঁদের প্রত্যেককে নিরুত্তর আর নিরাশ করেছে। বলেছে, 'উঁহু। এ সম্বন্ধে সমিতির সভ্যাদের রেকর্ড খুব ভালো নয়। যে সব সভ্যারা নতুন করে শাঁখা সিঁদুরের স্বাদ পাচ্ছেন তারা এমন করে ডুবে যাচ্ছেন ঘর-সংসারে যে চার আনা চাঁদা পর্যন্ত মিলছে না তাঁদের কাছ থেকে। সে দশা তো আমারও হতে পারে। তার চেয়ে একেবারে পাকা চুলেই ফের সিঁদুর পরব। দ্বিতীয়বার মুছবার আর ভয় থাকবে না। সমিতির ভিতটাও তত দিনে আশা করি পুরোপুরি পাকাপোক্ত হবে।'

বিভাস একটু থামল, তারপর আরও একটু চাপা গলায় বলল,

'কিন্তু অনেকেরই ধারণা এসব বাজে অজুহাত জয়ন্তীর। আসল মনের কথা নয়।'

অরুণ বলল, 'আসল মনের কথাটা তা হলে কি?'

বিভাস জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'কি জানি ভাই। মেয়েদের চরিত্র, মেয়েদের মন দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ।'

খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হল। শাঁখে আর হুলুধ্বনিতে সুরু হল বিয়ে। পরিতোষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল অরুণ, বিদায় নিল কন্যাকর্তা বিভূতিবাবুর কাছ থেকে, বিভাসকে ঠিকানা দিয়ে বলল, 'দেখা কোরো।'

কেবল বলল না কিছু জয়ন্তীকে। তাকে এড়িয়েই পেরিয়ে গেল বাড়ীর সদর দরজা। বাস অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। বরযাত্রীদের যাঁরা দু এক জন যেতে পারেন নি তাঁদের জন্য নারী-কল্যাণ সমিতি হঠাৎ ভারি সদয় হয়ে উঠেছেন। নিজেদের ব্যয়ে ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন একখানা। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি। সহযাত্রীরা তাড়াতাড়ি গিয়ে সীট দখল করেছেন। অরুণও সেইদিকে যাচ্ছিল পিছনে কার পায়ের শব্দে মুখ ফিরে তাকাল। দেখল, জয়ন্তী দ্রুত এগিয়ে আসছে তার দিকে। অরুণের কাছাকাছি এসে ব্লাউসের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বের করল ছোট চাঁদার খাতা। হেসে বলল, 'সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক। আমাদের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না একথা সবাই জানে। পালিয়ে গেলে আমরা পিছু নিই। আর চাঁদাটা এমনই জিনিস জোর জবরদস্তী ছাড়া তা আদায় হয় না।'

গাড়ির ভিতর থেকে যে সব সহযাত্রী মুখ বাড়িয়ে ছিল তারা

কের সভয়ে মুখ লুকাল। অরুণও বিব্রত বোধ করল একটু। তারপর পকেট হাতড়ে বের করল দশ টাকার একটি নোট। এইটিই শুধু আছে। গৃহিনীপনা জানে কল্যাণী। স্বামীর ঘড়িপকেটে অযথা বেশি টাকা গুঁজে দেওয়ার সে কোনদিন পক্ষপাতী নয়। সে টাকা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হিসাব পাওয়া যায় না খরচের।

অরুণ ভাবল জয়ন্তী খুব খুশী হবে এই অপ্রত্যাশিত দানে। কিন্তু জয়ন্তীর কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। দশ টাকার নোটখানা দেখেও ঘাড় নাড়ল জয়ন্তী, মৃদু হেসে বলল, 'যাঁরা অসামান্য তাঁদের কাছ থেকে সামান্য পাঁচ দশ টাকা তো আমরা নিই নে।'

অরুণ বিরক্তির স্বরে বলল, 'আমি অসামান্য নই। আর এই দশ টাকা ছাড়া এখন কিছু নেইও আমার কাছে।'

জয়ন্তী বলল, 'কি জানি, কারো কারো তো এখনো অসামান্য বলেই ধারণা। তাছাড়া টাকা না থাকলে তার বদলে ব্যক্তি-বিশেষের কাছ থেকে আমরা অন্য জিনিসপত্রও নিয়ে থাকি।

কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য জিনিসপত্রই বা অরুণের কাছে এখন কি আছে? হঠাৎ জয়ন্তীর দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের আঙুলের দুটি আংটির দিকে চোখ পড়ল অরুণের। দামীটি শ্বশুরবাড়ির। কম-দামীটি নিজের। ছাত্র বয়সে মা দিয়েছিলেন। সেই থেকে আছে হাতে। অনামিকায় বড় আঁট হয়, তাই রেখেছে কনিষ্ঠায় পরিয়ে। মনে পড়ল সেই প্রথম প্রেমের সময় জয়ন্তীকে দু এক বার পরিয়েছে এই আংটি। প্রতিবারই ফেরৎ দিয়েছে জয়ন্তী। লোকে দেখলে কি বলবে। আজ কি, এত দিন বাদে লোকভয় লোপ পেয়েছে

জয়ন্তীর। হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করল অরুণ। তারপর আঙুল থেকে খুলতে চেষ্টা করল শ্বশুরের দেওয়া পোকরাজ বসানো আংটিটি।

কিন্তু জয়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, এত বড় দান সইবে না। তাছাড়া দাতাকে হয়তো এর জন্য বউয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তার চেয়ে নিজেরটি দেওয়াই ভালো।'

আংটিটি খুলে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে অরুণ বলল, 'কিন্তু আংটিটি আজ যদি নিজের হাতে পরিয়ে দিতে যাই জয়ন্তী ফের দারোয়ান ডাকবে না তো?'

জয়ন্তী হেসে উঠল, 'ওমা, বলছ কি তুমি? নিজের হাতে পরিয়ে দেবে কাকে? দেখছ না কি মোটা হয়ে গেছি, ও আংটি তো কড়ে আঙুলেও লাগবে না আমার। আমি চাইছিলুম রেবার জন্য। ওর ভারি সখ আংটি পরবার। তাড়াতাড়িতে দিয়ে উঠতে পারি নি।'

অরুণ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর আংটিটি তুলে দিল জয়ন্তীর হাতে।

তার পরিবর্তে জয়ন্তী দিল একখানা ছাপানো কার্ড। তাদের নারীকল্যাণ সমিতির নাম ঠিকানা। বলল, 'যদি কোন দরকার হয় চিঠি দিয়ো।'

অসিতবাবু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, বললেন, 'চলুন, দেখুন তো গল্পে-গল্পে কত রাত হয়ে গেল।'

বললুম, 'তা একটু হল বইকি। কিন্তু আমার সুপারিশ চিঠির খামের ওপর নাম ঠিকানা তো লেখেন নি।'

অসিতবাবু বললেন, 'ও ভবি দেখছি ভুলবার নয়, সুপারিশ চিঠিটা বেশ মনে রেখেছেন দেখছি।'

সাদা খামটা টেনে নিয়ে মাথা একটু নিচু করে তার ওপর ঠিকানা লিখতে লাগলেন অসিতবাবু, 'সম্পাদিকা, ফরিদপুর নারী-কল্যাণ সমিতি, বউবাজার ব্রাঞ্চ, ফরডাইস লেন, কলিকাতা।'

স্বাচ্ছন্দ্যে আর পরিতৃপ্তিতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে অসিতবাবুর মুখ। অরুণ কি এখনো প্রেমপত্র লিখছে জয়ন্তীকে ?

পাণ্ডুলিপি

ঘর গুছোতে গিয়ে ব্যাপারটা ধরা পড়ল। কয়েক দিন ধরেই অসিত স্ত্রীকে বলছিল, 'বইয়ের র‍্যাক আর তাকগুলি বড় এলোমেলো হয়ে আছে। ঘরের দিকে আর তাকানো যায় না। একটু সাজিয়ে গুছিয়ে যদি না রাখ, লোকে তোমাকেই বদনাম দেবে।'

মনীষা বলে, 'বাঃ রে, আমি শুধু একা বদনামের ভাগী হব কেন?'

অসিত জবাব দেয়, 'তুমি ছাড়া আর কে হবে। গৃহিনী গৃহমুচ্যতে। ঘর দেখলেই লোকে টের পায় এ বাড়ির ঘরনীটি কেমন উড়নচণ্ডী।'

মনীষা বলে, 'আর বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি যে ভোলা মহেশ্বর সেকথা বুঝি লোকে টের পায় না? আমি যত গুছিয়ে রাখি তুমি তত এলোমেলো করে দাও। এদিক থেকে তোমার স্বভাব ঠিক একেবারে বাচ্চুর মত। আমি একা তোমাদের দু জনকে সামলাই কি করে!'

অসিত গলা নামিয়ে মুখ টিপে হেসে বলে, 'এর পরে কত জনকে সামলাতে হবে?'

মনীষা আরক্ত হয়ে মাথা নাড়ে, 'মোটেই না। আর একটিও না। তুমি চেয়েছিলে বলেই—আমার মোটেই দরকার ছিল না। ওর জন্যই তো আমার বি-এ'র রেজাল্ট অমন খারাপ হল। ওর জন্যই—।'

দেড় বছরের দুরন্ত শিশু তক্তাপোশের তলা থেকে বেরিয়ে ধুলোমাখা হাতে মাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে।

মনীষা বি-এ ফেলের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে কোমল সুখস্পর্শ অনুভব করতে করতে বলে, 'ছাড় ছাড়, গেল আমার শাড়ীটা।'

এমনি ছোটখাট অনেক দুঃখের কথাই ওরা ভুলেছে। অসিত রায়, মনীষা রায় আর ওদের দেড় বছরের ছেলে বাচ্চু রায়। এখনো তার স্থায়ী ভালো নাম রাখা হয় নি। অন্নপ্রাশনের সময় বাচ্চুর দিদিমা নাম রেখেছিলেন পার্থসারথি। সে নাম অসিত আর মনীষা মনে মনে দু জনেই নাকচ করেছে। কিন্তু মনোমত দ্বিতীয় নাম এখনো খুঁজে পায় নি।

ক্ষুদ্রতম একটি সুখী পবিবার পণ্ডিতিয়া প্লেসের দু রুমের এই ফ্ল্যাটটিতে এসে বাসা বেঁধেছে। তার মধ্যে একটি ঘর শয্যাকক্ষ। শুধু খাট আলমারী ড্রেসিং টেবিল নয়, মনীষার গৃহস্থালির আরো নানা টুকিটাকি জিনিসপত্রে বোঝাই। দ্বিতীয় ঘরখানি অসিতের লাইব্রেবী আর ড্রয়িং রুম।

এই ঘর নিয়েই বিবাদ। এই ঘব নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কৃত্রিম কলহ শুরু হয়। শেষে অবশ্য কৃত্রিমতাটুকু আর থাকে না। অনেক রাত অবধি জেগে অসিতকে মান ভাঙাতে হয়।

কলেজ স্ট্রীটের একটি বড় পাবলিশিং ফার্ম-এ কাজ করে অসিত। প্রথমে অবশ্য সেলসম্যান হিসাবেই ঢুকেছিল। এম-এ ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু কলমের জোরে, বুদ্ধির জোরে, ব্যক্তিত্বের জোরে পদগৌরব আর বেতনের অঙ্ক দুই-ই বাড়িয়ে নিতে পেরেছে অসিত। এখন সে পাবলিশারের প্রকাশযোগ্য ম্যানাসক্রিপ্ট নির্বাচন করে, এডিট করতে গিয়ে অনেক সময় বইয়ের খোলনলচে বদলে দেয়। তরুণ কবিযশপ্রার্থীরা শুধু নিজের নামটি ছাপার

অক্ষরে দেখেই খুশী থাকে। ইংরাজী, বাংলা দুই কলমই চলে অসিতের। অবসর সময় কলেজের পরীক্ষার্থীদের জন্য নোট লেখে, ইয়ারবুকের গোটা কয়েক চ্যাপ্টার লিখে দেয়। নানা ধরনের সংকলন গ্রন্থ সম্পাদন করে। অর্থাগমের বিভিন্ন পথের দিকে তার লক্ষ্য আছে।

আর লক্ষ্য বই সংগ্রহের দিকে। ইংরাজী, বাংলা, নতুন, পুরোন নানা ধরনের নানা বিষয়ের বই সঞ্চয়ের দিকে তার ঝোঁক। আলমারী, র্যাক, আব দেওয়ালের তাকগুলি সব বোঝাই হয়ে গেছে। নতুন বই রাখবার আর জায়গা নেই। এ নিয়ে মনীষা প্রায়ই রাগ করে, 'তোমার কেবল বই জমাবার দিকে ঝোঁক। যত বই আনো তত তো পড় না।' অসিত বলে, 'এখন অত পড়বার সময় কই। ভবিষ্যতে পড়ব। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পড়বে। বই তো শুধু এক পুরুষের জন্য নয়, পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা উত্তরপুরুষে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই তো বই লেখা, বই রাখা।' মনীষা বলে, 'লেকচার তো খুব লম্বা লম্বা দিচ্ছ। কিন্তু বই রাখতে হলে তার জন্যে খাটতে হয়, যত্ন করতে হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে ঝাড়-পোঁছ করতে হয়। শুধু বগলদাবা করে রাশ রাশ বই বাড়িতে এনে পৌঁছে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। আমার ছোট কাকাকে দেখেছি নিজের হাতে তিনি তাঁর লাইব্রেরী গোছান। বউ, ঝি, ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকর কাউকে হাত দিতে দেন না। আর তোমার সব পরের হাতে।' অসিত বলে, 'তুমি কি পর? তুমি কি পরস্ত্রী?' মনীষা রাগ করে সামনে থেকে সরে যায়।

স্ত্রীর খোঁটা আর খোঁচা খেয়ে খেয়ে অসিত শেষ পর্যন্ত নিজেই

তার সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বেরোল। ছুটির দিনে সকালে আড্ডার লোভ ত্যাগ করে নিজেই বইগুলির ঝাড়-পোঁছ, গোছ-গাছ শুরু করল। র‍্যাক থেকে অনেকগুলি বাংলা উপন্যাস অন্তর্হিত হয়েছে। তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া।

অসিত বলল, 'এ তোমার বন্ধুদের কীর্তি। যারা নিয়েছে তারা আর ফেরত দেবে না।'

মনীষা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মুখের ঘাম আঁচলে মুছতে মুছতে জবাব দিল, 'মোটেই না। তোমারই বান্ধবীদের কাণ্ড। আমার বন্ধুরা আর ক'দিন আমার থাকে। দু দিন আসতে না আসতেই তারা তোমার বান্ধবী হয়ে যায়। তুমিই তাদেব সেধে সেধে বই দাও।'

এ অভিযোগের ঠিক উপযুক্ত জবাব না দিতে পেয়ে অসিত আবার বই গুছানোয় মন দেয়। একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে পুবদিকেব দরজার ওপর যে তাকটা আছে সেই তাকের বইগুলি একটা একটা করে নামাতে থাকে। আর কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে পড়ে লম্বা পুরু হাতে লেখা একটা খাতা।

অসিত সঙ্গে সঙ্গে সেখানা হাতে তুলে নেয়। ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'জোয়ার ভাঁটা।' খানিকটা নিচে লেখকের নাম, 'প্রাণকুমার চক্রবর্তী।'

অসিত অস্ফুট স্বরে বলে, 'মাস্টার মশাইয়ের সেই উপন্যাসের ম্যানাসক্রিপ্ট। কিন্তু কী দশা হয়েছে এর!'

খাতাটা হাতে নিয়ে টুলের ওপর থেকে নেমে আসে অসিত দু চার পাতা করে উল্টে দেখে। অর্ধেকেরও বেশি ড্যাম্প লেগে

পচে গেছে। একটি লাইনও ভালো করে পড়া যায় না। শেষার্ধের দুর্দশা অত বেশি হয়-নি। মোটামুটি পড়া যায়।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে অসিত স্ত্রীর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'মনীষা, মনীষা!'

মনীষার কড়ায় তখন মাছের ঝোল। সে রান্নাঘর থেকেই জবাব দিল, 'কেন অমন করে ডাকছ? কি হয়েছে বল না?

অসিত অধীর হয়ে বলল, 'তুমি এসো এখানে।'

মনীষা বলল, 'আমার উনুনে মাছ। আমি এখন যেতে পারব না। তোমাকে তো তখনই বললাম, খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরের পরে ওসব গুছানো-টুছানোর কাজ ধরা যাবে। এখন কি আমার নিঃশ্বাস ফেলবার জো আছে। ঝিটাকে এক সপ্তাহের ছুটি দিয়ে তুমি খুব উদারতা দেখালে। আমি যে মরি সেদিকে তোমার লক্ষ্য নেই।'

অসিত আর কোন কথা না বলে খাতাটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ক্ষোভ, হতাশা আক্রোশ মেশানো এক অদ্ভুত স্বরে বলল, 'কী অবস্থা হয়েছে দেখেছ?'

উনুনের কড়া থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মনীষা বলল, 'কি ওটা?'

'চিনতেও পারছ না, মাস্টার মশাইর সেই ম্যানাস্ক্রিপ্টখানা।'

মনীষা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আহা কি করে ওভাবে নষ্ট হল?'

অসিত বলল, 'তুমিই জানো। সে বার বই-টই গোছাবার সময় তুমিই বোধহয় রেখেছিলে।'

মনীষা বলল, 'দেখ মিছমিছি সব দোষ আমার ওপর চাপিয়ো

না।। নিচের র‍্যাকে পড়ে ছিল। বাচ্চুর টানাটানিতে খাতাটা প্রায় যায় যায়। আমি ওপরের তাক্ে তুলে রাখলাম। তুমি ত তখন সামনেই ছিলে।'

অসিত নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দেখে বোঝা গেল ভেতবের রাগটা সে অতি কষ্টে হজম্ করবার চেষ্টা করছে।

মনীষা তা গ্রাহ্য না করে বলতে লাগল, 'ছি-ছি-ছি। বুড়ো ভদ্রলোক পাঁচ বছর আগে দিয়ে গেছেন খাতাটা। ছাপতে পারবে না তুমি তখনই জানতে। এব মধ্যে তুমি খাতাটা একদিন ফেরৎ দিয়ে আসতে পারলে না?'

অসিত বলল, 'থাক থাক, তোমার আর লেকচার ঝাড়তে হবে না। কর্তব্য জিনিসটা আমরা পরকে শেখাই। নিজেরা কবে দেখি নে। দায়িত্ববোধ তোমারও যে কত বেশি তা আমার জানতে বাকি নেই।'

খাতাখানা হাতে নিয়ে আবার বসবাব ঘরে ফিরে এল অসিত। এই মুহূর্তে বই গোছাবার উৎসাহ তার আর নেই। এলোমেলো বইগুলিকে কোনরকমে তাকে ঠেলে রেখে খাতাখানা টেবিলের ওপর রেখে দিল।

বছর পাঁচেক আগে প্রাণকুমারবাবু তাঁর এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানা নিয়ে এসেছিলেন। অসিতদের স্কুলের অঙ্কের টীচাব ছিলেন প্রাণকুমারবাবু। লম্বা চওড়া চেহারা। বয়সে অবশ্য তখনই প্রৌঢ়। তাঁর হাঁকডাকে স্কুলসুদ্ধ ছেলেরা কাঁপত। তাঁর সহকর্মীরাও ভয়ে তটস্থ থাকতেন। প্রাণকুমারবাবু সেক্রেটারীর কাছে কার নামে কখন গিয়ে কি লাগাবেন কে জানে! সেক্রেটারী

বিপিন ঘোষালের বাড়ির প্রাইভেট টিউটর ছিলেন প্রাণকুমারবাবু। সামান্য টীচার হলেও মফঃস্বল শহরের থানা, কাছারি, লোন অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড সর্বত্র প্রাণকুমারের গতিবিধি ছিল। আর খুব কড়া করে খাতা দেখতেন প্রাণকুমারবাবু। অসিত অতি কষ্টে তাঁর কাছে পাশের মার্ক পেত। টেস্টে তু নম্বর কম দিয়ে তিনি তাকে প্রায় আটকে রাখবার জো করেছিলেন। হেড মাস্টারের সুপারিশে শেষ পর্যন্ত এলাউড হয়।

সেই প্রাণকুমারবাবুকে এখন প্রায় চেনাই যায় না। চেহারা ভারি রোগা হয়ে গেছে। মাথার চুল সব পাকা। অবশিষ্ট দাঁতের সংখ্যা পাঁচ-সাতটির বেশি নয়। শরীর সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। গায়ে আধ-ময়লা পাঞ্জাবি। পায়ে পুরোনো এক জোড়া ফিতে-বাঁধা জুতো।

তবু মুখের আদলে অসিত ঠিকই চিনতে পারল। মাথা নিচু করে পায়ের ধূলো নিয়ে বলল, 'স্যার আপনি!'

প্রাণকুমারবাবু হেসে বললেন, 'এলাম তোমার কাছে। অনেক খুঁজে খুঁজে ঠিকানা যোগাড় করে এলাম।'

বসবার ঘরখানার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ঈস, একেবারে বইয়ের রাজ্য বানিয়ে ফেলেছ দেখছি। আমাদের স্কুল-লাইব্রেরী বেশ বড়ই ছিল। দেখেছ তো তিন-চারটে আলমারী বোঝাই ছিল বইতে। কিন্তু তোমার মত এত বই আমরা যোগাড় করতে পারি নি। তোমার বাহাতুরি আছে অসিত, বাহাতুরি আছে।'

তারপর নিজের কাহিনী সংক্ষেপে বললেন। পার্টিশনের পরে

দেশ ছেড়ে এসেছেন। এখন আছেন বরানগরে। না, কোন কলোনি-টলোনিতে নয়। বাড়ি ভাড়া করেই আছেন। ওখানকারই একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। ট্যুইশানও জুটেছে দুই একটা। টেনে-মেনে কোন রকমে চলে যায়। সংসারে লোকজন তো বেশি নেই। স্ত্রী তো আগেই গেছেন। সতীলক্ষ্মী! তাঁকে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয় নি। মেয়ে তিনটিরও বিয়ে দিয়েছেন। দুটি স্বামীর ঘর করছে। আর সব চেয়ে ছোট সুধা। সে বছর যেতে না যেতে সিঁদুর মুছে ফিরে এসেছে। সে-ই এখন বাপের দেখা-শোনা করে।

প্রাণকুমারবাবু অবশেষে একটু হেসে বললেন, 'সুধার কথা তোমার মনে আছে তো অসিত? অঙ্কের নম্বর বার করবার জন্যে তোমরা যাকে শসা, পেয়ারা, আখ ঘুষ দিতে? আর আমি টের পেয়ে লাঠি নিয়ে তাড়া করতাম।'

অসিত বলল, 'খুব মনে আছে মাস্টারমশাই। আহা, সুধা অত কম বয়সে বিধবা হল! বেচারা!'

প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'কি আর করব বাবা! যার ভাগ্যে যা আছে—তা কে খণ্ডাবে? দেখে-শুনেই তো দিয়েছিলাম।' একটু চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর মুখে হাসি টেনে বললেন, 'যাক গে। তোমার কাছে যে জন্যে এসেছি তা এবার বলি। এই নাও।'

ফুলস্কেপ কাগজের মোটা একখানা খাতা প্রাণকুমারবাবু অসিতের সামনে রেখে বললেন, 'তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। এখন তোমার যা ধর্মে-কর্মে হয় তাই কর।'

অসিত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার মাস্টারমশাই ?'

প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'আরে খুলে দেখই না বাবাজী। একখানা উপন্যাস লিখেছি।'

বৃদ্ধের মুখে কিশোর-সুলভ লজ্জা ফুটে বেরোল। সেই লজ্জা লুকোবার জন্যে মৃদু হেসে মুখখানা একটু ফিরিয়ে রাখলেন প্রাণকুমারবাবু।

অসিতের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি। সে বলল, 'বলেন কি মাস্টারমশাই, আপনি শেষ পর্যন্ত উপন্যাস লিখলেন !'

প্রাণকুমারবাবু এবার মুখ ফেরালেন, 'হ্যাঁ লিখেছি। আরে অঙ্কের মাস্টার বলে কি মনে কোন রস-কষ নেই ভেবেছ ?'

অসিত অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না না, তা বলছি নে।'

প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'সব ছিল অসিত, সব ছিল। শুধু তোমাদের কাছে প্রকাশ করতাম না। অমনিতেই তো তোমরা মানতে চাইতে না। তারপর যদি এ সব বাতিকের কথা জানাজানি হয়ে যেত তাহলে কি আর রক্ষা থাকত ? কাব্যরোগ আমার তখন থেকেই। হেডমাস্টার মশাই একটু একটু জানতেন। আর কাউকে টের পেতে দিই নি।'

অসিত বলল, 'সত্যি আমরা তো কিছুই জানতাম না।'

প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'তখন জানবার বয়স হয় নি বাবা। এখন বড় হয়েছ এখন বলি। পুত্রমিত্রবদাচরেৎ, এখন আর লজ্জা কি। অঙ্কের মাস্টারদের মনেও রস-কষ থাকে বাবাজী দুনিয়াদারির সুখদুঃখ হাসিকান্নায় তারাও ডোবে, ভাসে, হাবুডুবু খায়। সেই সব কথাই বসে বসে লিখেছি। পড়ে দেখ। অনেক

কষ্ট করে অনেক যত্ন নিয়ে লিখেছি। পড়ে-টড়ে যদি ভালো লাগে একটা সদ্‌গতি কোরো।'

মাস্টারমশাইকে সেদিন চা আর খাবার আনিয়ে আপ্যায়ন করেছিল অসিত। মনীষাকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর দু জনে অনুরোধ করেছিল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়ার জন্যে।

প্রাণকুমারবাবু তাতে রাজী হন নি। বলেছিলেন, 'আর একদিন এসে খাব। কিন্তু খাইয়ে আমাকে কি আর খুশী করবে অসিত! সবচেয়ে বেশি খুশী হব যদি ওর একটা ব্যবস্থা করতে পার।' আঙুল দিয়ে খাতাটা ফের একবার দেখিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'টাকা-পয়সা কিছু চাই নে অসিত। বিশ পঁচিশ কেউ যদি দয়া করে দেয় দেবে। না দিলেও দুঃখ নেই। আমি চাই বইটা ছাপা হোক। দশজনে পড়ুক। এত কষ্ট করে লিখলাম জিনিসটা—সকলে দেখুক। তারপর তোমাব মত এখন যারা বড় বড় লাইব্রেরী করবে, তাদের শেল্‌ফের হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে আমার জন্যেও ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা যদি কেউ ছেড়ে দেয়, আমি তাতেই কৃতার্থ। আর কিছু চাই নে অসিত!'

রাস্তার মোড় পর্যন্ত অসিত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এসেছিল। ভরসা দিয়ে বলেছিলো, 'ভাববেন না মাস্টারমশাই, আমি চেষ্টা করে দেখব।'

প্রাণকুমারবাবু খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'আমি তা জানি বাবা। তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। এই খাতাখানা নিয়ে কত জনের কাছেই না ঘুরেছি! কেউ তোমার মত এমন ভালো

ব্যবহার করে নি। ভেবে লজ্জা হচ্ছে তোমার মত ছেলেকে তখন কত গালমন্দ, মারধোর করেছি। সে সব কথা মনে রেখ না বাবা। তখন অত কড়া হয়েছিলাম বলেই তো তুমি এত বড় হতে পেরেছ।'

অসিত লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'কি যে বলেন মাস্টারমশাই!'

'জোয়ার-ভাঁটা'র দু চার পাতা পড়েই অসিত বুঝেছিল এ লেখা চলবে না। ভাষা কাঁচা, ভাবের মধ্যে পক্বতা বলে কিছু নেই। ধরন দেখে বোঝা যায় লেখকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। কিন্তু জীবন-যাপন করার চেয়ে সাহিত্যে তাকে স্থাপন করা কম কঠিন কাজ নয়। তবু প্রকাশককে অসিত একবার দেখিয়েছিল। খাতাখানা তিনি নেড়ে-চেড়ে দেখে হেসে বলেছিলেন, 'আপনার কেউ হন বুঝি?' অসিত বলেছিল, 'আমার ছেলেবেলার মাস্টারমশাই।' তিনি বলেছিলেন, 'রেখে দিন। অমন মাস্টারমশাই আমারও অনেক ছিলেন। এখনো মাঝে মাঝে এসে হানা দিতে ছাড়েন না।'

খাতাখানা তখনই ফেরৎ পাঠাতে অসিতের সঙ্কোচ হয়েছিল। বুড়ো ভদ্রলোক দুঃখ পাবেন। তার চেয়ে 'অশুভস্য কালহরণম্'ই ভালো। প্রাণকুমারবাবু চিঠিতে দু এক বার খোঁজ নিয়েছিলেন বইটার। অসিত লিখেছিল, 'চেষ্টা চলছে।' তারপর এই চার বছরের মধ্যে তিনিও আর খাতাটা ফেরৎ চান নি। অসিতেরও আর দিয়ে আসা হয় নি। সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা সে আগা-গোড়া ভুলেই গিয়েছিল।

দুষ্কৃতির দায়ভাগ নিয়ে অসিত আর মনীষার দাম্পত্যকলহ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। দুপুরের পরেই তা মিটে গেল। মনীষা

রাঁধে ভালো। আমিষ-নিরামিষে সমান হাত। চাটনির স্বাদটুকু জিভের ডগায় যেন একেবারে লেগে থাকে।

বিকেলের দিকে বাচ্চুকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে বেরোবার আগে দু জনে চা খেতে খেতে ব্যাপারটা নিয়ে আর একটু আলোচনা করল। যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। তবে মাস্টারমশাইকে ব্যাপারটা লিখে দেওয়া যাক। তাঁর কাছে আর যদি কোন কপি থাকে সেটা নিয়ে না হয় ফের চেষ্টায় নামা যাবে। না হয় নিজেদের গাঁটের টাকা কিছু খরচ করে কোনরকমে ছেপে দেবে বইটা।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে দু পয়সার একখানা পোস্টকার্ড মনীষা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এক্ষুনি লিখে দাও বাপু। আজ নয় কাল করে তুমি আবার ছ মাস কাটাবে। শেষে দোষ হবে আমার।'

একটু ভেবে নিয়ে অসিত সংক্ষেপে লিখল :

শ্রীচরণেষু,

মাস্টারমশাই, আপনার 'জোয়ার-ভাঁটা' বইখানা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কববার আছে। আপনি যদি দয়া করে একবার আসেন বড় ভালো হয়। আর সব কথা সাক্ষাৎমত বলিব। ইতি

অসিত রায়

সপ্তাহখানেকের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ এল না। অসিত আর মনীষা ভাবল বাঁচা গেছে। বইখানি সম্বন্ধে বোধ হয় মাস্টার-মশাইয়ের মমত্বও এতদিনে নষ্ট হয়েছে। নইলে অনেক আগেই তিনি খোঁজখবর নিতে পারতেন।

পরের রবিবার সকালে স্বামী-স্ত্রীতে মুখোমুখি চায়ের টেবিলে বসেছে। বাচ্চুও দুধ খাবে না, চা খাবে। তার হাতে বিস্কুট গুঁজে দিয়ে অনেক কষ্টে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করছে মনীষা, ঠিক সেই সময় বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। এত সকালে কে আবার এল! একটু বিরক্ত হয়েই অসিত দরজা খুলে দিল। খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে সুধা। এতকাল বাদেও চিনতে ভুল হয় নি। পরনে ফিতে-পেড়ে শাড়ি। সাদা ব্লাউসের হাতা কনুইর একটু আগে এসে থেমে গেছে। হাতে একগাছি করে সরু চুড়ি ছাড়া সারা দেহে কোন আভরণ নেই। ঘন কালো চুলের রাশ এলো-খোঁপায় জড়ানো। কিন্তু আশ্চর্য! এত রিক্ততার মধ্যেও ওর রূপ ফুটে উঠতে বাধা পায় নি। গায়ের রঙে, শরীরের গড়নে, মুখশ্রীতে অসিতদের সেই ছোট শহরে রূপবতী বলে সুধার যে খ্যাতি ছিল এই বড় শহরে এসেও তা একেবারে নিষ্প্রভ হয় নি। অসিতরা ওর নাম দিয়েছিল দৈত্যকন্যা দেবযানী। অসিতের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের ছোট ছিল সুধা। এখন ওর বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না।

অসিত শেষ পর্যন্ত বলল, 'সুধা তুমি!'

সুধা বলল, 'হ্যাঁ অসিতদা, তোমার চিঠি পেয়ে এলাম।'

অসিত বলল, 'বেশ বেশ। এসো ঘরে এসো।'

বাইরের ঘরে নয়, একেবারে ভিতরের ঘরে তাকে নিয়ে গেল অসিত। মনীষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। অসিত নিজের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বোসো সুধা। তারপর কি ব্যাপার? মাস্টারমশাই কোথায়? তিনি এলেন না যে।'

সুধা একটু থেমে বলল, 'তিনি নেই অসিতদা।'

'নেই মানে?'

সুধা বলল, 'ছ মাস আগে মারা গেছেন। প্রায় বছর তিনেক ধরে ভুগছিলেন।'

অসিত জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল তাঁর?'

সুধা বলল, 'ক্রনিক কোলাইটিস তো ছিলই। শেষের দিকে আরো নানা উপসর্গ জড়িয়ে গিয়েছিল। বুড়ো বয়সে যা হয়।'

'তুমি তা হলে এখন আছ কোথায়?'

সুধা বলল, 'যে বাড়িতে ছিলাম সেখানেই। আর এক ঘর ভাড়াটের পেয়িং গেষ্ট হয়ে আছি। বাবা যে স্কুলে মাস্টারি করতেন তারই গার্ল সেকশনে কাজ পেয়েছি একটা। বাবার ধমকানিতে ঘরে বসে বসে রক্ষা যে, আই-এ'টা পাশ করেছিলাম। না হলে অন্ন জুটত না।'

একটু চুপ করে থেকে সুধা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'বাবার বইটা তা হলে তোমরা পাবলিশ করেছিলে অসিতদা!' এক ফোঁটা তৃপ্তির হাসি দেখা গেল সুধার ঠোঁটে। তারপর একটু করুণ সুরে বলল, 'বাবা অসুখের মধ্যেও অনেকবার বলেছেন বইটার কথা। দেখে যেতে পারলে খুশী হতেন। দেখি কি রকম গেটআপ-টেট-আপ হয়েছে।'

অসিত একবার স্ত্রীর দিকে তাকাল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'না, বইটা ঠিক পাবলিশ করা এখনো হয়ে ওঠে নি সুধা।'

'তাহলে বুঝি এখনো প্রেসে আছে?'

অসিত বলল, 'না, ঠিক প্রেসেও দেওয়া হয় নি।'

সুধা বলল, 'তবে? ম্যানাসক্রিপটা কি এখনো তোমার কাছেই পড়ে আছে?'

অসিত বলল, 'হ্যাঁ আমার কাছেই আছে। তবে খাতাটা অসাবধানে ইয়ে—মানে একটু জখম হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে আর কোন কপি আছে কি? সেই জন্যেই খবর দিয়েছিলাম। এবার তা হলে একটু এডিট-টেডিট করে, ভালো একজন পাবলিশার দেখে—।'

সুধা বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু অসিতদা আর কোন কপিই যে নেই। দেখি, দাও তো খাতাটা।'

দেরাজ খুলে মনীষা খাতাটা বের করে দিয়ে বলল, 'দেখুন, সত্যিই বড় অন্যায় হয়ে গেছে।'

খাতাটা একটু উল্টে-পাল্টে দেখে সুধা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর চাপা অভিযোগের সুরে বলল, 'এর যে কিছুই আর নেই অসিতদা।'

অসিত আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে মানে খানিকটা আছে।'

সুধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সেটা তোমার দয়ায় নয়, উই আর ইঁদুরের দয়ায়। বাবা তোমাকে অনেক বিশ্বাস করেছিলেন, তোমার ওপর অনেক নির্ভর করেছিলেন। তার খুব প্রতিদান দিলে।'

স্বামীকে রক্ষার জন্য মনীষা এবার এগিয়ে এল। সুধার দিকে চেয়ে সে বলল, 'দেখুন, দোষটা শুধু আমাদেরই নয়। এতদিন হয়ে গেল, আপনারাও তো এক আধ বার খোঁজ-খবর নিতে পারতেন।'

সুধা শ্লেষ করে বলল, 'ঠিক কথা বউদি, আপনাদের কোন দোষ নেই।'

তারপর অসিতের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি মাঝে মাঝে বলতাম, বইটার কি হল, একটা খোঁজ নাও বাবা। তিনি বলতেন, অত ব্যস্ত হস নে সুধা। অসিতকে অস্থির করে তুলে লাভ নেই। বড় বড় পাবলিশারের ঘরে কত বই শুনেছি পাঁচ-সাত বছরও পড়ে থাকে। তারপরে বেরোয়। আমি না দেখে গেলেও তুই দেখতে পারবি। আসলে তাঁর ভয় ছিল পাছে তুমিও ফেরৎ দাও। আর তাঁর সব আশা নির্মূল হয়ে যায়। চলি অসিতদা, চলি বউদি।'

সেই অর্ধেক-পচে-যাওয়া খাতাটা হাতে নিয়ে সুধা দোরের দিকে পা বাড়াল।

মনীষা এগিয়ে এসে বলল, 'সেকি, এক কাপ চাও অন্তত খেয়ে যাবেন না?'

সুধা মাথা নেড়ে বলল, 'না, চা আমি বেশি খাই নে।' তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নামল।

অসিত গেল তার পিছনে পিছনে। রাসবিহারী য়্যাভিনিউ পার হয়ে বাস স্টপের কাছে দু জনেই দাঁড়াল। সুধা অসিতের সঙ্গে একটি কথাও বলল না, এক বার তাকালও না। সঙ্গে আসতে তাকে নিষেধও করল না, আহ্বানও করল না। ভারি অন্যমনস্ক। কোন দিকে সুধার কোন খেয়াল নেই।

একটু বাদে খাতাখানার শেষদিকটা খুলে পড়তে লাগল সুধা। আর তার দু চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। পাণ্ডু-লিপির বাকিটুকুও বুঝি যায়।

অসিত এবার আরো কাছে এগিয়ে এল। কোমল মৃদু অনুতাপের সুরে বলল, 'কেঁদো না সুধা। আমাকে মাপ করো।'

সুধা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'জানো অসিতদা, শেষের দিকে বাবা শুধু আমার কথা লিখেছেন, শুধু আমার কথা! আমরা যে দু জনে দু জনের সব ছিলাম।'

পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সুধা।

অসিতও সেইদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জীবনে কত ভুল, কত ত্রুটি, কত অন্যায়, কত বিচ্যুতিই ঘটেছে। এই অসতর্কতা তার তুলনায় কিছুই নয়। তবু এই মুহূর্তে অসিতের মনে হতে লাগল এ অপরাধের বোঝা সবচেয়ে দুর্বহ, দুঃসহ। জীবনভর অনুতাপ করলেও এর দুঃখ লজ্জা আর গোপন শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে না।

গোঁফ

প্রথম থেকেই ভবেন্দুর মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল যে কিছু একটা ঘটেছে। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে একসঙ্গে সকাল বেলায় চা খেতে বসে ভবেন্দু। এটা তার বহুদিনের পারিবারিক নিয়ম। চায়ের আসরে ভবেন্দু কোনদিন নিজের অফিসের গল্প করে, কোনদিন গল্পেব গণ্ডীটা ছড়াতে ছড়াতে সাহিত্য রাজনীতি কি খেলার মাঠে পৌঁছায়। এই প্রাতঃকালীন চায়ের আসরেই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোব খোঁজ-খবব নিয়ে পিতার দায়িত্ব পালন করে ভবেন্দু। তারপব সারাদিনেব মধ্যে ওদের সঙ্গে আর তার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। চায়েব পাট শেষ করে বাজার সারে, খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে দাড়ি কামায়। কড়া দাড়ি, কামাতে বেশ একটু সময় লাগে। যেটুকু লাগা দরকার তার চেয়ে কিছু বেশি সময়ই নেয় ভবেন্দু। আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে হয়ত একটু গুনগুন করে, কিংবা যা খুশী তাই ভাববার জন্যে মনকে খানিকক্ষণ ছেড়ে দেয়। দাড়ি কামাবার এই আধ ঘণ্টাকে নিভৃত বিলাসের জন্যে রেখেছে ভবেন্দু।

সুদীপ্তি মাঝে মাঝে খোঁটা দিয়ে বলে, 'তুমি আবার আমার চুল বাঁধার কথা বল। দাড়ি কামাতে তোমার যতক্ষণ লাগে, চুল বাঁধতে আমার তার অর্ধেক সময়ও লাগে না।'

ভবেন্দু বলে, 'লাগে কি না লাগে ঘড়ি ধরে মিলিয়ে নিও। তাছাড়া তোমার প্রসাধনের সঙ্গে আমার প্রসাধনের কি তুলনা

হয়। তুমি এক মনে বাঁধো, আর আমি আনমনে ফেলি। এক জনের সাধনা অর্জনের আর একজনের বর্জনের। নারী আর পুরুষের প্রকৃতির তফাৎটা তাদের চুল দাড়ির সম্বন্ধে এ্যাটিচুডেই টের পাওয়া যায়।'

এ ধরণের দাম্পত্যালাপ দৈনন্দিন শেভ করবার সময় যেমন জমে তেমন আর কখনো জমে না। নিজের দাড়ি কামাবার সময় যতখানি খোশ-মেজাজে থাকে ভবেন্দু, টাকা কামাবার সময় তেমন থাকতে পারলে আর কথা ছিল না।

ক্ষৌরকার্যের পর স্নানাহার তারপর অফিস; অফিসের পর রাত দশটা অবধি বন্ধুচক্রে ব্রীজের আড্ডা। স্ত্রীর সঙ্গে তার পরেও দেখা হয়। গঞ্জনা আর মানভঞ্জনের পালা চলে, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সকাল বেলায় এই চা খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া আর বড় একটা দেখা হয় না ভবেন্দুর।

আজকের চায়ের আসরে স্ত্রী আর মেয়ে অন্যদিনের মত হাজির আছে। কিন্তু ছেলে আসে নি।

চায়ের কাপ সামনে নিয়ে ভবেন্দু প্রথমেই মেয়ের কাছে তার খোঁজ করল, 'বিশু কোথায় রে রুচি? সে বুঝি এখনও ওঠে নি? বিশু ও বিশু, আয় এ ঘরে।'

রুচিরা বলল, 'না বাবা, দাদা তো অনেকক্ষণ উঠেছে।'

ভবেন্দু বলল, 'তবে তাকে দেখছি নে যে। বাবু বুঝি আজ আবার মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন?'

রুচিরা এবারও প্রতিবাদ করল, 'না বাবা, দাদা ও ঘরে বসে পড়ছে।'

ভবেন্দু বলল, 'হুঁ, পড়ায় কত মনোযোগ। আসতে বল এ ঘরে। বল যে আমি ডাকছি।'

রুচিরা মুখ নিচু করে হাসল, 'দাদা আজ এখানে চা খেতে আসবে না বাবা। তার চা-টা ওঘরে দিয়ে আসতে বলেছে আমাকে।'

সুদীপ্তিও হেসে বলল, 'হ্যাঁ তাই যা। চা আর খাবার ও ঘরেই দিয়ে আয় রুচি।'

একে তো ছেলের অবাধ্যতা, তারপর স্ত্রী আর কন্যা দু জনেরই এক সঙ্গে এই দুর্বোধ্য মোনালিসার হাসি। মেজাজ বিগড়ে গেল ভবেন্দুর। বিরক্ত হয়ে বলল, 'ব্যাপার কি? সকাল বেলায় অমন ফিক ফিক করে হাসছ কেন তোমরা? বিশু আসছে না কেন এখানে?'

হাসি চেপে রুচি দাদার চা আর খাবারের প্লেট পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। সে জানে বাবার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ভারটা মার ওপর ছেড়ে দেওয়াই নিরাপদ।

সুদীপ্তি স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'যত রাগ কর, যতই বকাবকি কর ছেলে আজ আর সহজে তোমার সামনে বেরোবে না।'

ভবেন্দু বলল, 'কেন করেছে কি? চুরি করেছে না বদমায়েসি করেছে যে মুখ দেখাতে তার এত লজ্জা?'

সুদীপ্তি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'কথার কি ছিরি। সকাল থেকেই মুখ মেজাজ অমন খারাপ করছ কেন। তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়।'

ভবেন্দু গম্ভীর ভাবে বলল, 'বেশ দায় যদি হয় বলো না।'

আজ আর গল্প জমল না। তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ করে ভবেন্দু উঠে পড়ল। খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল। এ ঘর একই সঙ্গে ভবেন্দু গুপ্তের ড্রয়িং রুম আর তার ছেলে বিশ্বরূপের রীডিং রুম।

রুচি হাত নেড়ে ইশারায় ইঙ্গিতে দাদার কাছে কি যেন বলছিল, বাপকে দেখে পাশ কেটে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। ভাই বোনের মধ্যে দারুণ ভাব। বিশু পড়ে সেকেণ্ড ইয়ারে আর রুচি ক্লাস টেন-এ। এখনো ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরে নি। কিন্তু মায়ের ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে স্কুলে যাওয়ার আগে সাজগোজ করতে শিখেছে। মেয়েকে পালাতে দিল ভবেন্দু। ভ্রূ কোঁচকালেও কোন রূঢ় কথা বলল না। কিন্তু ছেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমত ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'ব্যাপার কিরে বিশু। খুব নবাব হয়েছিস দেখছি। তোর চা এখানে এনে দিতে হবে তবে তুই খাবি। ও ঘরে গেলি নে কেন?'

বিশু ঘাড় গুঁজে মুখ না তুলে বলল, 'এমনিই গেলাম না বাবা।'

ভবেন্দু বলল, 'গেলি নে তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কেন গেলি নে তার জবাব চাইছি।'

বিশু কোন জবাব দেওয়ার চেষ্টা মাত্র করল না। বইয়ের ওপর ঝুঁকে চেয়ারে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

ছেলের এই ঔদ্ধত্যে ভবেন্দু আরো বিরক্ত হল। রূঢ় স্বরে বলল, 'তোকে কতদিন বলেছি গুরুজন কেউ সামনে এলে উঠে দাঁড়াতে হয়, তা-ই এটিকেট। কিন্তু কিছু কি শেখার দিকে তোদের মন আছে? পড়াশুনো হচ্ছে না ছাই হচ্ছে।'

এবার বিশ্বরূপ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বাপের মুখের দিকে তাকাল না। ঘাড় নিচু করেই রইল।

ভবেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি হয়েছে কি শুনি। কোন অপকর্ম্ম করে এসেছিস যে মুখ তুলে তাকাতেই পারছিস নে।'

বিশ্বরূপ এবার ভয়ে ভয়ে মুখ তুলল। তার আশঙ্কা হল এরপর ভবেন্দু হয়ত নিজেই তার মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরবে। রাগলে তো বাবার তেমন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বিপদ যখন এসেছে, তাকে যখন আর বারণ করবার জো নেই, তখন বরণ করে নেওয়াই ভালো।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভবেন্দুর আর বুঝবার কিছু বাকি রইল না। সব একেবারে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। চৌদ্দ বছরের মেয়ে আর চৌত্রিশ বছরের মা কেন তুই সমবয়সী সখীর মত এতক্ষণ হাসাহাসি করছিল, কেন ডাকাডাকি সত্ত্বেও বিশুর অমন সংকোচ হচ্ছিল তার সামনে যেতে সব বুঝতে পারল ভবেন্দু। ষোল বছরের ছেলের ঠোঁটের ওপর যে কচি শ্যামল গোঁফ গজিয়েছিল তা চেঁছে মুছে একেবারে নির্মূল করে এসেছে বিশু। আর তার ফলে ভবেন্দুর মনে হল ওকে বেয়াড়া, বকাটে, ইঁচড়ে-পাকা ছেলের মত দেখাচ্ছে।

ভবেন্দু চীৎকার করে বলল, 'হতভাগা কোথাকার! অমন করে গোঁফ চাঁছতে তোকে কে বলেছে। এই বয়সে কেউ গোঁফ ফেলে?'

ততক্ষণে সুদীপ্তিও পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে মৃত্থ হেসে বলল, 'আমিও তাই বলছিলাম! এত অল্প বয়সে গোঁফ ফেললে

কি ভালো দেখায়? কাল সন্ধ্যায় সেলুনে গিয়ে তোমার ছেলে এই কাণ্ড করে এসেছে! এবার সেফটি রেজর কিনে দাও ছেলেকে। নইলে তোমার রেজর নিয়ে টানাটানি করবে।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভবেন্দু মুখ বিকৃত করে বলল, 'তুমি হাসছ, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই হাসির নয়। এত স্পর্ধা ওর? যা খুশি তাই করবে? আজ গোঁফ কামাবে কাল ঘাড় কামাবে, পরশু ঠিক সিগারেট ফুঁকবে তোমার মুখের ওপর।' সুদীপ্তি বলল, 'যদি ফোঁকেই শুধু আমার মুখের ওপর কেন, তোমার মুখের ওপরও ফুঁকতে পারবে। সব ব্যাপারেই তোমার বাড়াবাড়ি। ছেলেমানুষ, না ভেবে চিন্তে একটা কাণ্ড করে ফেলেছে, বেশ তো ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বল। তা না, তুমি একেবারে বাড়ি মাথায় করে তুলেছ।'

ভবেন্দু স্ত্রীর কথায় বিকৃত প্রতিধ্বনি করে বলল, 'মাথায় করে তুলেছ! তোমার আস্কারা পেয়েই তো ছেলে এমন নষ্ট হচ্ছে! একটু শাসন করতে গেলেই তুমি তেড়ে আসবে।'

সুদীপ্তি বলল, 'কর না শাসন, তোমাকে আটকাচ্ছে কে। ছেলেমেয়েকে শাসনও করতে হয়, আবার এক সময় মিষ্টি কথায় বুঝিয়েও বলতে হয়। কিন্তু তোমার মত দিনরাত খিট খিট কোন বাপ করে না। খাওয়া নিয়ে পরা নিয়ে জুতোর রঙ থেকে মাথার চুল আঁচড়ানো পর্যন্ত সব ব্যাপারে তুমি ওদের পিছনে লেগে আছ। ওদের কিছুই তোমার পছন্দ হয় না। এমন করলে তোমাকে ওরা শত্রু বলে ভাববে।'

ভবেন্দু বলল, 'ভাবুক। তোমাকে মিতিন ডাকলেই যথেষ্ট।' এ যাত্রা রেহাই পেয়েছে ভেবে বিশু ফের বই নিয়ে বসতে যাচ্ছিল,

ভবেন্দু আবার তাকে ডেকে আনল, 'এই, চলে যাচ্ছিস যে। আমার কথার জবাব দিয়ে যা।'

এতক্ষণে প্রথম গোঁফ কামানোর দরুন বিশুর লজ্জা আর ভয় দুইই দূর হয়েছে। বাপের কথার জবাবে এবার বিরক্ত আর রুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'কি জবাব দেব। মার কাছে তো শুনলেই সব।'

'বাঁদর কোথাকার! আবার মাকে সাক্ষী মানা হচ্ছে? জানিস যে আমি ও ধরনের অকালপক্কতা পছন্দ করি নে, তবু তোর এমন স্পর্ধা হল কি করে? গোঁফ ফেললি কেন?'

বিশু বলল, 'বাঃ রে, আমি ফেলেছি নাকি। সেলুনের পরামানিক—'

ভবেন্দু বলে উঠল, 'যাক যাক। তোব আর বাজে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। সেলুনের পরামানিক নয় কি লণ্ড্রীর ধোপা এসে তোর গোঁফ চেঁছে দিয়ে গেছে? তুই বলেছিস তাই চেঁছেছে।'

বিশু হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তুমি পটল পরামানিককে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো। সে নিজেই দুষ্টুমি করে হাসতে হাসতে—'

সেলুনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসবার প্রস্তাবে ভবেন্দু এমন চটে গেল যে শেষের কথাগুলি তার আর কানেই গেল না। ভবেন্দু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বাঁদর হতভাগা ছেলে। এত স্পর্ধা তোর! তুই আমার মুখে মুখে জবাব দিবি? আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করবি? এই লেখাপড়া, এই রকম সভ্যতা-ভব্যতা শিখছিস কলেজে গিয়ে? দরকার নেই আর পড়াশুনোর। আমি কালই সেখান থেকে নাম কাটিয়ে আনব। যা আমার সামনে থেকে চলে যা। বেরিয়ে

যা বাড়ি থেকে। আমি চাই নে অমন বকাটে বেয়াড়া ছেলের মুখ দেখতে।'

ভবেন্দুর মা সুধাময়ী পাশের সরকার-বাড়িতে প্রতিবেশিনীর খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। এ পাড়ায় এসে নতুন আলাপ হয়েছে তাঁর ও-বাড়ির ইন্দ্রমুখীর সঙ্গে। দু জনেই সত্তর পার হয়েছেন। বয়সের মিল থাকায় মনের মিল হতে বেশি দেরি হয় নি।

সুধাময়ী ফিরে এসে বললেন, 'বুড়ী জ্বরে ভুগছে তাই দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোদের কি হল রে। এই সকাল বেলায় অমন হাঁকাহাঁকি করছিস্ কেন? কি হয়েছে বউমা? কি নিয়ে লাগল তোমাদের?'

সুদীপ্তি বলল, 'আমাব সঙ্গে লাগে নি মা। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার ছেলের লেগেছে। কাল বিশু গোঁফ কামিয়ে এসেছে, তাই উনি বকছেন।'

সুধাময়ী হেসে বললেন, 'ও লক্ষ্মীছাড়া। সেই জন্যে ছেলেকে গালাগাল দিতে হয়! দেখ তো আমার দাদুর মুখখানা লজ্জায় কি রকম লাল টুকটুক করছে।'

ভবেন্দু বলল, 'যাও। তোমাদের আস্কারা পেয়ে পেয়েই ও ওই রকম হয়েছে। পরকাল ঝর্‌ঝরে করে দিলে একেবারে।'

সুধাময়ী বললেন, 'অত যে রাগ করছিস, নিজের কথাটা একবার ভেবে দেখ তো। ওই বয়সে তুমি নিজেই কি কম জ্বালিয়েছ নাকি? তোমার নিজের কীর্তি-কাহিনী কি সব ভুলে গেছ?'

'যাও, যাও। হয়েছে।' বলতে বলতে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে ভবেন্দু নিজেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। মোড়ের দোকান থেকে

সিগারেট কিনে নিল এক প্যাকেট। তারপর একটা ধরিয়ে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে পার্কের নিরালা গাছের ছায়া-ঢাকা বেঞ্চিটিতে গিয়ে বসল। বেশ রোদ উঠেছে এতক্ষণে। সকালে যারা বায়ু-সেবনে বেরোয় তারা সবাই ফিরে গেছে। পার্ক প্রায় জনশূন্য। না, ঠিক জনশূন্য বলা চলে না। প্রৌঢ় আর বৃদ্ধের দল বিদায় নিলেও ছেলেরা আছে। কয়েক জন মুচকুন্দ গাছের ডালে উঠে ফুল পাড়ছে। পুকুরে সাঁতার কাটতে নেমেছে জন কয়েক। সিগারেট টানতে টানতে তাদের সেই ঝাঁপাঝাঁপি দাপাদাপি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ভবেন্দু। আজ তারও তাড়া নেই। রবিবারের ছুটি। বাজারটা অবশ্য করে দিয়ে আসে নি। কিন্তু তা ছেলেকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবে সুদীপ্তি।

আজ আর বন্ধুচক্রে আড্ডা দিতে যেতে ইচ্ছা করল না ভবেন্দুর। ছেলের গোঁফ তাকে নিজের প্রথম যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। ঠিক যৌবন নয়; কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণ। কত আর হবে। সিকি শতাব্দীও হবে না। মাত্র বাইশ তেইশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু সে কথাগুলির সবই যেন এরই মধ্যে ভুলে গেছে ভবেন্দু। বিনা প্রসঙ্গে তা আর সহজে মনে পড়তে চায় না। যেন ব্যাঙ্কের একাউনট্যান্ট হয়েই জন্মেছে ভবেন্দু। বাড়িতে কড়া বদমেজাজী বাপের ভূমিকা ছাড়া যেন আর কোন ভূমিকা তার কোনদিন ছিল না।

অথচ তারও ওই বয়স ছিল, ওই দিন ছিল। মা ঠিকই বলেছেন, ভবেন্দুও কম জ্বালায় নি। প্রথম গোঁফ ফেলবার বিবরণ ভবেন্দুরও কম বিচিত্র নয়।

নিজের ঠোঁটের উপরকার সেই প্রথম শ্যাম-আচ্ছাদনের কথা মনে পড়ল ভবেন্দুর। গোঁফ তো নয়, লজ্জা আর বিস্ময় মাখানো কচি কচি দুটি পাখা। আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মুখের এই রূপান্তর লক্ষ্য করত ভবেন্দু। কিন্তু বিস্ময় আর আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হল না। ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে না উঠতে দাড়ি আর গোঁফ দুইই স্পষ্ট হয়ে উঠল ভবেন্দুর মুখে। ফলে তার বয়স যে ষোল এ কথা কেউ আর বিশ্বাস করে না। শুধু সহপাঠীরা নয়, মাস্টার মশাইরা পর্যন্ত এই নিয়ে বক্রোক্তি করেন, 'আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি, এবার থেকে শেভ করা শুরু করে দাও ভবেন্দু।'

ব্যাকরণ ভুল হলে পণ্ডিত মশাই দাড়ি গোঁফের খোঁটা দেন। অথচ ভবেন্দু জানে তাদের ক্লাসের বিনয় চিন্নারা বয়সে তার চেয়ে বড় ছাড়া ছোট নয়। কিন্তু মাকুন্দ হয়ে জন্মেছে বলে ওরা এই বয়সেও বালকত্ব বজায় রেখেছে।

গাঁয়ের ঠাকুরমা দিদিমা সম্পর্কিতরা ঠাট্টা করে বলেন, 'আমাদের নাতি এবার লায়েক হয়েছে। আরে এসো এসো কাছে এসো, লজ্জা কি। দেখি না চাড়া দেওয়ার মত বড় হল নাকি গোঁফ-জোড়া।'

নন্দী-বাড়ির যুগল ঠাকুরদার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নতুন ঠানদি দেখলেই রসিকতা করেন, 'যে বিড়ালে ইঁদুর মারে তার গোঁফ দেখলে যায় চেনা। তুমি ভাই শিকারী বিড়াল। কত বললে তোমার বয়স ? ষোল ? আরও কমিয়ে বল। বাও কি তেও।' হেসে ওঠেন নতুন ঠানদি—'কুড়ি বছরের একটি দিনও কম নয়। গোঁফ দেখেই সব বুঝতে পারছি ভাই। একেবারে ঝুনো নারকেল।'

ভারি লজ্জা পায় ভবেন্দু, বাড়ন্ত গোঁফের জন্য বিব্রত হয়ে ওঠে।

পাড়ার পরামানিক ফটিক শীল। বকুলতলায় বসে সারা গাঁয়ের জোয়ান বুড়োর মাথায় কাঁচি আর বগলে গালে ক্ষুর চালায়। আর অবিরাম আদিরসের গল্প করে। ভবেন্দু তাকে গিয়ে ধরল, 'ফটিকদা, তুমি যা চাও, তাই দেব, আমার দাড়ি গোঁফে একবার ক্ষুর চালিয়ে দাও, যেন জুলপি কাটতে কাটতে অসাবধানে কামিয়ে ফেলেছ, ইচ্ছা করে ফেল নি।'

ফটিক জিভ কেটে বলল, 'ওরে বাবা। অত বড় ঝুঁকি আমি নিতে পারবো না ভাই। গুপ্ত মশাই তা হলে আমাকে জুতো পেটা করে গ্রামছাড়া করবেন। তোমার দাড়ি মুড়োতে গিয়ে আমি ভাই মাথা মুড়োতে পারব না।'

ভবেন্দুর বাবা ভবশঙ্কর গুপ্ত গায়ের এম.-ই. স্কুলের হেড মাস্টার। যেমন কড়া, তেমনি গোঁড়া। তাঁর ভয়ে শুধু যে ছাত্ররাই অস্থির হত তাই নয়, অভিভাবকেরাও তটস্থ হতেন। তিনি বলতেন, 'গার্জিয়ানদের দোষেই ছেলেরা নষ্ট হয়।' তিনি পাড়া-পড়শীর চাল-চলন আচার-আচরণের নির্মম সমালোচনা করতেন। কারো কোন রকম শৈথিল্য সহ্য করতেন না। আড়ালে আব্‌ডালে লোকে তাঁকে বিশ্বনিন্দুক বলত। কিন্তু সামনে তাঁকে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না।

বাড়িতেও ভবেন্দু আর তার মা-বোনেরা সব সময় বাবাকে ভয় করত, এড়িয়ে চলত। ভবেন্দুর বেশ মনে আছে একদিন যদি কোন কারণে তার বাবা অন্য কোন গ্রামে কি গঞ্জে গিয়ে থাকতেন ভবেন্দুর আনন্দের সীমা থাকত না।

ফটিক শীল একদিন ভবেন্দুর চুল ঘাড়-ছাঁটা করে দিয়েছিল। সামনে রেখে দিয়েছিল বড় বড় চুল। ভবশঙ্কর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন পরামানিকের কাছে। যা নয় তাই বলে তাকে গালাগাল দিয়ে ছেলের মাথা ফের কদম 'ফুল করে এনেছিলেন।

পরিণামের কথা ভেবে পবামানিক তাই পিছিয়ে গেল।

জেলা শহর থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এল ভবেন্দু। দুই গালে আর নাকের নিচে ততদিনে আষাঢ়ের ঘাসের মত দাড়ি গোঁফ বেশ ঘন হয়ে গজিয়েছে।

মা বললেন, 'তোদের বংশের ধাবা। অকালে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল হয় তোদের। তা বাপু, ক্ষুর না লাগাস না লাগালি। কাঁচি দিয়ে ছোট করে ছেঁটে ফেললেও তো পারিস।'

ভবেন্দুর বাবা শুনে বললেন, 'খবরদার। এখন ক্ষুর কাঁচি কিচ্ছু না। তা হলে দাড়ি আরো শক্ত হবে, কড়া হবে। আগেকার দিনের লোকে দাড়ি রাখতেন। তাতে তাঁদের স্বাস্থ্য ভালো থাকত, আয়ু বাড়ত। এখনকার লোকে শুধু ফ্যাশন-সর্বস্ব, তাদের আর কিচ্ছু নেই।'

ভবশঙ্কর নিজে কিন্তু একাদন বাদে বাদে নাপিত ডেকে নিখুঁতভাবে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলেন। ভবেন্দুর মা একদিন ঠাট্টা করে বলেন সে কথা। তিনি ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলেন, 'আমার বয়স আর তোমার ছেলের বয়স কি এক? আমার বুদ্ধি আর তোমার বুদ্ধি কি সমান বলে মনে কর?'

গোঁফ কামাবার একটা সুযোগ জুটে গেল শেষ পর্যন্ত। পাশের

গ্রাম শ্রীপুরে ভবেন্দুর মামার বাড়ি। পরীক্ষা দিয়ে ভবেন্দু সেখানে বেড়াতে গেল এবং শিগগির আর ফিরল না। ঘন দুধ আর টাটকা মাছের সঙ্গে নিঃসন্তান, মামা মামীর আদর-যত্ন অবাধে উপভোগ করতে লাগল। বাবার শাসনের গণ্ডী থেকে বেরোতে পেরে যেন এই প্রথম মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল ভবেন্দু। পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশে তাস খেলে, সিগারেট টানে আর থিয়েটারের মহড়া দেয়। বঙ্গেবর্গী পালা অভিনয় করবে তারা। সবাই ঠিক করেছে ভবেন্দুকে নিতে হবে ভাস্কর পণ্ডিতের মেয়ে গৌবীর পার্ট। দলের মধ্যে ভবেন্দুর মত সুদর্শন ছেলে আর নেই। দলের অধিপতি সুধীরদা বললেন, 'ফিমেল পার্টে তোমাকে চমৎকার মানাবে। দাড়ি-গোঁফেব জঙ্গল সাফ করলে ভবেন্দুব ভিতব থেকে দিব্যি ইন্দুমতীর মুখ বেবিয়ে আসবে।'

স্ত্রী-ভূমিকা নিতে ভবেন্দু প্রথমে বাজী হয় নি। তারপর একটা ব্যাপারের কথা ভেবে মত দিয়েছে।

এদিকে সুধীরদার ছোট বোন মল্লিকাদিও পিছনে লেগেছেন ভবেন্দুর। তাঁদের বাড়িতেই থিয়েটাবের আড্ডা। মল্লিকাদি বড় পেট্রন। তিনি তাঁব শাড়ি দিয়ে গয়না দিয়ে সাহায্য করবেন।

রিহার্সেলের সময় মল্লিকাদি ভবেন্দুর মুখে গৌরীর পার্ট শুনতে শুনতে খিল খিল করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'ও ভবেন্দু, বলি ও ভবেন্দু, ওই এক মুখ দাড়ি নিয়ে কি মেয়েদের কথা বলা যায়, না মেয়েলি ভাব আনা যায় গলায় চোখে মুখে? দাড়ি গোঁফ কামিয়ে নাও, কামিয়ে নাও। আর ক্ষুর ধরতে ভয় হয় তো বল, দুই গালে দুই ছাগল বেঁধে দিই, তারা সব পরিষ্কার করে দেবে।'

ভবেন্দু বলে, 'তার আগে জামাইবাবুর গোঁফের গোড়ায় খুঁটো পুঁতে ছাগল বাঁধুন মল্লিকাদি। আমাদের নরম গোঁফের কথা পরে ভাববেন।'

মল্লিকাদি জবাব দেন, 'সে যে বড় দারোগার কড়া গোঁফ ভাই। সেখানে ঘেঁষতে সাহস পাই নে।'

ভবেন্দু বলে, 'সেই রাগে বুঝি আমাদের গোঁফ-দাড়ি উপড়ে ফেলতে চান?'

'কি আর করি, অভাবে স্বভাব নষ্ট।'

হাসতে হাসতে ভবেন্দুর গাল টিপে দেন মল্লিকাদি।

তরুণ ছেলেদের রোমহীন মুখমণ্ডল যে তাঁর পছন্দ, একথা ভবেন্দু টের পেয়েছে এবং টের পেয়ে খুশী হয়েছে।

মহড়া খুব জমল। স্টেজ রিহার্সেল খুবই ভালো হল। কিন্তু বাদ সাধলেন ভবেন্দুর বাবা। থিয়েটারের দিন ভোর বেলায় স্বয়ং এসে হাজির। কি করে যেন সব টের পেয়ে গেছেন।

ভবেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রথমে জলন্ত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর সিংহনাদ করে উঠলেন, 'হতভাগা বাঁদর, এখানে এসে এই সব হচ্ছে? গোঁফ কামিয়েছিস কেন?'

ভবেন্দু নির্বাক হয়ে রইল।

তার মামা হেসে জবাব দিলেন, 'নইলে ফিমেল পার্ট করবে কি করে? এ যাত্রা ছেড়ে দাও ভবশঙ্কর। ছেলেদের আনন্দটা মাটি কোরো না।'

ভবশঙ্কর শ্যালকের কথার জবাব দিলেন না। ছেলের গালে

চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে হয়ে তুমি এত তাড়াতাড়ি গোল্লায় যাবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।'

মল্লিকাদি পাশের বাড়ি থেকে এসে কাঁদো কাঁদো ভাবে বললেন, 'পিসেমশাই, ওকে শাস্তি দেবেন না। ওর কোন দোষ নেই, দোষ আমাদের।'

ভবশঙ্কর অসংকোচে বললেন, 'তা জানি। তোমরাই ওর মাথা খেয়েছ।'

মল্লিকাদির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কারো অনুরোধ রাখলেন না ভবশঙ্কর। ছেলেকে জোর করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। সে বারেব মত থিয়েটার পণ্ড হল। রাগ করে বাঁধা স্টেজ ভেঙে ফেললেন সুধীরদা।

বাড়িতে গিয়েও ভবশঙ্কর ছেলেকে খুব একচোট ধমকালেন, গালমন্দ করলেন। যত বার তিনি ছেলের গোঁফহীন মুখের দিকে তাকালেন ততবারই তাঁব চোখ দুটি জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। আব ভবেন্দুর মন ততই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল।

জেলা সহরে আই-এ. পড়তে এসে একটা বছর পিতৃ-আজ্ঞা মেনেছিল ভবেন্দু। তারপর সেকেণ্ড ইয়ার থেকে সে নিয়মিত গোঁফ দাড়ি কামিয়ে ফেলছে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে নি।

বয়স আর বিদ্যাবুদ্ধি বাড়বার পর সাহসও বেড়েছিল ভবেন্দুর। বাপের সামনে সে তাঁর গোঁড়ামি আর রক্ষণশীলতার সমালোচনা করত। চিঠিপত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। তিনি আজ আর নেই। গোঁড়া বাপের কথা ভেবে বহুদিন পরে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল ভবেন্দুর।

আরো খানিকক্ষণ এ-পথে ও-পথে ঘোরাঘুরি করে, দু একজন বন্ধুর বাড়িতে হাজিরা দিয়ে ভবেন্দু প্রায় বারোটার সময় বাড়িতে এসে ঢুকল।

আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভবেন্দুর মা নালিশ করলেন, দেখ এসে তোমার ছেলের কাণ্ড। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, গোমড়া-মুখো হয়ে ঘরের কোণে বসে আছে। আর কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো তো জবা ফুল করেছে একেবারে। এমন সৃষ্টিছাড়া ছেলে আমি আর দুটি দেখি নি বাপু। তোমরাই কি কম বকুনি খেয়েছ। কিন্তু এমন একগুঁয়ে কোনদিন ছিলে না তোমরা। সারা বাড়ি সুদ্ধ সেধে সেধে হয়রান। কিন্তু তোমার ছেলেকে নড়ায় কার সাধ্য।'

ভবেন্দু হেসে বলল, 'আচ্ছা মা, তুমি ভেতরে যাও। আমি দেখি গিয়ে ও কি করছে।'

কলমের ডগা দিয়ে খাতার উল্টো পিঠে নিজের মনে আঁকিবুকি করছিল বিশু, বাবাকে দেখে শক্ত হয়ে বসল। উদ্ধত অবাধ্য ভঙ্গিতে ঘাড় গুঁজে রইল টেবিলের ওপর। পিতৃমুখ দেখবার বাসনা তার আর মনে নেই।

ভবেন্দু আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। তারপর স্মিতমুখে সস্নেহে হাত রাখল ছেলের পিঠের ওপর। কোমলকণ্ঠে বলল, 'বিশু, ওঠ।'

বিশ্বরূপ কোন জবাব দিল না।

ভবেন্দু বলল, 'একটু রাগ করেছি বলে ওই রকম করে নাকি। লক্ষ্মী বাবা, ওঠো।'

হঠাৎ ভবেন্দু সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভব করল। এই প্রথম

নিজের ছেলেকে পিতৃ-সম্বোধন করল ভবেন্দু। এর আগে কোনদিন করতে পারে নি। লজ্জা করেছে, কেমন যেন বাধো বাধো লেগেছে মুখে। কিন্তু আজ নিজের মুখের বাবা ডাক নিজের কানেই বড় অদ্ভুত শোনাল। অদ্ভুত নয়, অপূর্ব। পূর্বশ্রুত হয়েও অপূর্ব। নিজের গলায় বাবার গলা শুনতে পেল ভবেন্দু। শাসন করবার পর বাবাও ঠিক এই রকম করতেন। বাবাও ঠিক এমনি 'বাবা' বলে আদর করতেন। ভবেন্দুর দুই চোখ ছল ছল করে উঠল। ভবশঙ্কর লুপ্ত হন নি, তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছেন। ভবেন্দুও একদিন এমনি করে লুকোবে, তার বিশুর মধ্যে, বিশ্বরূপের মধ্যে।

ছেলের সাড়া না পেয়ে ভবেন্দু ধরা গলায় ডাকল, 'তুই বড় নিষ্ঠুর বিশু। বাবা আমাকে যত মারধোরই করুন যে মুহূর্তে বাবা বলে ডাকতেন আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতাম, তাঁর কোলের কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াতাম। তুই বড় নিষ্ঠুর।'

এবার জোর করে বিশুর মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে চিবুকে হাত দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরল ভবেন্দু। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলের কীর্তি চোখে পড়ল। কলমের গোড়া দোয়াতে ডুবিয়ে নিজের ঠোঁটের ওপর মস্ত একজোড়া গোঁফ এঁকেছে বিশ্বরূপ। আর স্বহস্ত-অঙ্কিত সেই গোঁফের প্রভায় পরম অপরূপ দেখাচ্ছে তার মুখ।

পরীক্ষা

নবভারত' ব্যাঙ্কের কলেজ স্ট্রীট ব্রাঞ্চের ম্যানেজার শীতাংশু দত্ত কতকগুলি জরুরী চিঠিতে সই করছিল। তার খাস বেয়ারা বলাই এসে বলল, 'একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

শীতাংশু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আমি একটু ব্যস্ত আছি, একাউনটেন্ট ক্ষিতীশ বাবুর কাছে যেতে বল না। তিনি কি করছেন?'

বলাই বলল, 'আজ্ঞে মহিলাটি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাচ্ছেন। ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে যে দরকার ছিল তা হয়ে গেছে তাঁর। এতক্ষণ তো তাঁর টেবিলেই বসে থাকতে দেখে এলাম।'

কথায় বার্তায় বলাই বেশ চটপটে। হাফ প্যান্ট পরা বছর চোদ্দ-পনেরর এই সুদর্শন ছেলেটি শীতাংশুর খুব প্রিয়। টাইপ করা চিঠিগুলি থেকে চোখ তুলে শীতাংশু তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা তা হলে আসতে বল।'

একটু বাদে কাটা দরজা ঠেলে একটি শ্যামবর্ণা পুষ্টাঙ্গী মহিলাকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। শীতাংশু তাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে একটু উঠবার ভঙ্গি করে বলল, 'আরে সুধাবউদি আপনি যে! বসুন বসুন।'

সামনের গদি আঁটা চেয়ারগুলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল শীতাংশু। তারপর গলায় আর একটু বিস্ময়ের সুর মিশিয়ে বলল, 'আপনি এখানে!'

সুধারাণী শীতাংশুর ঠিক সামনের চেয়ারটায় বসে বলল, 'কেন,

আমাদের কি একেবারেই আসতে নেই ? গরীব মানুষ, বড় একাউন্ট খোলবার মত টাকা কোথায় পাব। কিন্তু ছোট খাট এক আধটা সেভিংস একাউন্ট তো আমাদের থাকতে পারে।'

শীতাংশু উল্লাসের ভঙ্গি করল, 'ও, আপনি একাউন্ট খুলবেন, তাই বলুন। খদ্দের লক্ষ্মী, যত আসেন ততই আমাদের ভাগ্য। আর অত বিনয় করছেন কেন। স্মল কজ কোর্টে সরোজ গুহের পসার প্রতিপত্তির কথা আমরা সবাই জানি।'

সুধারাণী হেসে বললেন, 'বাবার পশার প্রতিপত্তিতে আমার কি এসে গেল। আমি তো স্কুলের গরীব মাস্টারনী।'

শীতাংশু হাসল, 'ও, শুনেছি বটে, আপনি শখ ক'রে স্কুলের টীচারিও নিয়েছেন। সেই স্কুলের একাউন্ট খুলবেন এখানে ?'

সুধারাণী বলল, 'না। সে স্কুল ভবানীপুরে। এতদূরে এসে তার একাউন্ট খোলায় কোন সুবিধে নেই।'

শীতাংশু বলল, 'তবে ?'

সুধারাণী বলল, 'একাউন্ট আমাব নিজেরই, তিন বছর আগে এ পাড়ায় যখন ছিলাম এই ব্রাঞ্চে খুলেছিলাম। বাসা বদলের পরে ভাবলাম একাউন্টটাও ট্রান্সফার করে নিই।'

শীতাংশু বলল, 'তাই নিলেই তো সুবিধে। বাসার কাছাকাছি ব্যাঙ্ক থাকাই তো ভালো।'

সুধারাণী সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'কিন্তু দেখলাম তার চেয়েও ভালো হয় একাউন্টটা এই ব্রাঞ্চে থাকলে। তুমি যখন এখানকার হর্তাকর্তা এখানে একাউন্ট রাখলে কিছু সুযোগ সুবিধে নিশ্চয়ই হবে। পঁচিশ টাকা ব্যালেন্স থাকলে তিরিশ টাকার চেক

অন্তুতঃ কাটতে পারব, কি বল ?' রসিকতার ভঙ্গিতে সুধারাণী হাসল। শীতাংশু লক্ষ্য করল গালে ভাঁজ পড়েছে সুধারাণীর। পড়বে বই কি, বছর চল্লিশেক বয়স তো নিশ্চয়ই হয়েছে সুধা বউদির, দেখতে বরং আরো কিছু বেশিই মনে হয়। মোটা হয়ে যাওয়ার জন্যেই হয়ত। সুধাবউদি বোধ হয় জানেন না যে হাসলে আর তাঁকে আগের মত সুন্দর দেখায় না। আর তাঁর বোধ হয় খেয়ালও নেই যে, সম্পর্কিত দেওরের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করবার মত জায়গা এই জনবহুল কর্মব্যস্ত ব্যাঙ্ক নয়। শীতাংশুর হাতে অনেক জরুরী কাজ আছে।

সুধারাণীর রসিকতার জবাব না দিয়ে শীতাংশু সামনের চিঠি-গুলির দিকে একটু চোখ বুলিয়ে মুখে হাসি টেনে বলল, 'বউদি, আব একদিন যাব আপনাদের বাড়িতে, গিয়ে অনেকক্ষণ বসে গল্প করব, আজ একটু তাড়া আছে। কিছু মনে করবেন না।'

মুখখানা গম্ভীর হল সুধারাণীর। বোঝা গেল অপমানটা তার লেগেছে। শীতাংশু ভাবছিল এবার সুধাবউদি উঠে দাঁড়াবেন। কিন্তু আশ্চর্য, সুধারাণীকে হাসতে দেখা গেল—একটু টেনে আনা জোর করা হাসি, তবু একটু আগেকার সেই স্থূল সাধারণ রসিকতার হাসির চেয়ে এ হাসি শীতাংশুর চোখে ভালো লাগল, এ হাসিতে যেন অনেকদিন আগের সেই তীব্রতার তীক্ষ্ণতার স্পর্শ আছে।

সুধারাণী বলল, 'মনে করব বই কি! কেউ একজন ঘাড় ধরে বের করে দিতে চাইলেও কিছু মনে করব না, মনটা কি তেমনই মরে গেছে শীতাংশু ?'

শীতাংশু এবার অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'কি যে বলেন বউদি। আমি কিন্তু—। আপনার যতক্ষণ খুশি বসুন না এখানে।'

সুধারাণী ফের একটু হাসল, 'এই আবার বাড়াবাড়ি করে বসলে। যতক্ষণ খুশি ততক্ষণই ঠিক বসতে পারব না। তুমিই বা তা দিতে পারবে কেন। আমি এক্ষুনি উঠবো। শোন, আমার ছোট ছেলে ছানু এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করেছে। জনকয়েক বন্ধু-বান্ধবকে সেই উপলক্ষে কাল রাত্রে খেতে বলেছি। তোমা-দেরও নেমন্তন্ন, ছায়া আর মিতু রিতুকে নিয়ে তুমি কিন্তু কাল অবশ্যই যাবে। আমি তোমাদের সিমলা স্ট্রীটের বাসায় গিয়ে ছায়াকেও অবশ্য বলে আসব। কিন্তু সেখানে যখনই যাই শুধু ছায়াকেই পাই, কায়াকে তো আর দেখি নে। তাই তোমাকে তোমার এই অফিসেই বলতে এলাম।'

শীতাংশু বলল, 'আপনার এত কষ্ট করবার দরকাব ছিল না। ছানু পাশ করেছে শুনে খুব খুশী হলাম। ফার্স্ট ডিভিসনে গেছে তো? আমি সব খবর রাখি। কানুর তো এবার থার্ড ইয়ার। সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ছে, তাই না?'

সুধারাণী হাসল, 'হ্যাঁ, তুমি সব খবর সঠিকভাবেই রাখ। সেদিকে তোমার কোন ত্রুটি নেই।'

শীতাংশু বলল, 'কিন্তু মস্ত ত্রুটি আপনার নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ রাখতে পারি নে। জানেন তো আমি চিরকালই কুনো, অসামাজিক মানুষ। তারপরে এই ব্যাঙ্কের চাকরি, সমাজ সামাজিকতা আর রাখতে দেয় না।'

সুধারাণী বলল, 'দেখ, মিথ্যে অজুহাত আর দিয়ো না।

কাজ-কর্ম ছুনিয়ার কার না আছে, তাই বলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বছরে দু এক বার কে না যায়। তুমি যে না যাও তাও নয়। সব জায়গায় সকলের বাড়িতেই যাও আমি জানি, শুধু আমার ওখানে যেতেই তোমার মন সরে না। নেমন্তন্ন করলে ফোন করে না যেতে পারার জন্যে দুঃখ জানাও, না হয় বউকে পাঠিয়ে দিয়ে দায় সারো। আমি সব জানি শীতাংশু, সব বুঝি।'

শীতাংশু বলল, 'কিন্তু আমার ব্যাপারটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনি মিথ্যেই রাগ করছেন। আমি সত্যিই—'

সুধারাণী তার কথায় বাধা দিয়ে ফের হাসল, 'যাক, তোমার আর সত্যি কথা বলে দরকার নেই। তুমি যে কত সত্যবাদী মানুষ তা আমার জানা আছে। শোন, তুমি যে নেমন্তন্ন রাখতে যাবে না তা আমি জানি।'

শীতাংশু বলল, 'কি যে বলেন, আমি কাল নিশ্চয়ই যেতে চেষ্টা করব।'

সুধারাণী হেসে বলল, 'সে চেষ্টার যে কি ফল হবে তা আমার জানা আছে। বেশ চেষ্টা কোরো। তবু কালকের নিশ্চয়তার চেয়ে আজকের নিশ্চয়তা অনেক ভালো। শোন, আমার একটা কথা রাখবে?'

শীতাংশু বিব্রত হয়ে বলল, 'বলুন।'

'এখন তো তোমার টিফিনের সময়, চল আমাকে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে।'

শীতাংশু বলল, 'কিন্তু আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমার হাতে সত্যিই খুব জরুরী কাজ আছে।'

সুধারাণী মোটেই দমল না, বরং আরও একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলল, 'থাক, শত কাজ থাক, হাজার কাজ থাক, আমার কাজ তার চেয়েও বড়। আমি আজ তোমাকে তুলে নিয়ে যাবই। জানো সে শক্তি আমার আছে? তুমি ম্যানেজারের গদিতেই থাকো আর যেখানেই থাকো—'

শীতাংশু মনে মনে হাসলো। আশ্চর্য দম্ভ সুধাবউদির। সে নিজেই জানে না তার এ দম্ভ কত মিথ্যে। একদিন হয়ত সে শক্তি ছিল সুধাবউদির। শীতাংশুকে শুধু মুখের কথায় ওঠাবার বসাবার শক্তি ছিল। কিন্তু বিনা ব্যবহারেও বারো তেরো বছব পবে সে শক্তি অক্ষুন্ন থাকে, একথা শুধু সুধাবউদির মত মেয়েবাই ভাবতে পাবে।

তবু শীতাংশু একবাব ঘড়ির দিকে তাকাল আর একবার টেবিলের কাগজপত্রেব ফাইলেব দিকে। তাবপরে ফোন তুলে পাশের ঘবে একাউনটেনটকে কিছু নির্দেশ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন কোথায় যেতে হবে।'

সুধারাণী একটু হাসল, 'চল, পছন্দ করে একটা শাড়ি কিনে দেবে।'

শীতাংশু বিস্মিত হয়ে বলল, 'শাড়ি!'

সুধারাণী বলল, 'হ্যাঁ। তোমাদের বাড়িতে লুঙ্গি, অফিসে স্যুট, কিন্তু আমাদের সব জায়গায় সব বয়সে শাড়িই সম্বল। চল, আগেকার মত তুমি নিজে দেখে রঙ বেছে দেবে।'

শীতাংশু মনে মনে হাসল। সেই আগেকার রঙ যে কতদিন আগে ধুয়ে মুছে গেছে সে খবর কি সুধাবউদি নিজেই রাখে না? তবু কেন এই ভান, কেন এই ভড়ং?

সুধারাণী শীতাংশুর কোন সাড়া না পেয়ে বলল, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তোমার কি কোন অসুবিধে হবে? পদমর্যাদায় বাধবে?'

শীতাংশু হেসে বলল, 'না না না। আর কোন বাধাবাধির কারণ নেই, চলুন।'

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হেঁটে শাড়ির দোকানে নয়, ওয়াই. এম. সি. এ-র চায়ের দোকানে গিয়েই উঠল সুধারাণী।

শীতাংশু বলল, 'চা খাবেন?'

সুধারাণী বলল, 'খাওয়াও না, এর আগে চা খাওয়াবার কত গরজ ছিল তোমার। আর আজ এমনি কপাল যে জোর করে হাত ধরে দোকানের মধ্যে টেনে না আনলে চায়ের কথা তোমার আর মনেই পড়ে না।'

এ সব কথার কোন জবাব না দিয়ে শীতাংশু কালো পর্দা ঢাকা কেবিনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। মুখোমুখি বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবেন?'

সুধাবাণী ঠোঁট টিপে হাসল, 'আরো মুখ ফুটে বলতে হবে? তুমি যা খাওয়াও তাই খাব, আজ যা দাও তাই নেব।'

কিন্তু শীতাংশু আজ আর এই পরিহাসে যোগ দিল না। বেয়ারা এসে দাঁড়ালে গম্ভীরভাবে দুটো কাটলেট আর চায়ের ফরমায়েস দিল।

সুধারাণী বলল, 'তুমি দেখে-শুনে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই না? না কি ভয়ও পাচ্ছ?'

শীতাংশু বলল, 'না ভয়ের আর কি আছে!'

সুধারাণী বলল, 'ভয়ের আর কিছু নেই তা ঠিক। কিন্তু কেন নেই শীতাংশু? আমি বুড়ী হয়ে গেছি বলে, মুটিয়ে গেছি বলে?'

সুরটা সেই পরিহাসের! কিন্তু সবটুকুই যেন পরিহাস নয়।

শীতাংশু একটু ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি কি আবোল-তাবোল বকতে সুরু করেছেন সুধাবউদি? আজ আপনার হয়েছে কি?'

সুধারাণী বলল, 'হবে আবাব কি, কিছুই হয় নি। বলতে পার একটু আবোল-তাবোল বকবাব ইচ্ছে হয়েছে। একদিন না হয় একটু বললামই শীতাংশু। এব আগে তুমি অনেকদিন বলেছ, আমি শুনেছি, আজ না হয় তুমি একদিন সহ্যই কবলে।'

শীতাংশু একটু বিস্মিতই হল। চেহাবার ধারটা সুধাবউদির সত্যিই মবে গেছে। কিন্তু কথাব ধাব তো যায় নি, ববং আবো যেন বেড়েছে। বয়স বাড়লে লোকে বোধহয় এমনি কথা-সর্বস্বই হয়—শুধু পবিহাস-সর্বস্ব। পবিহাস ছাড়া আব কি। নইলে এতকাল পবে সে সব কথা তোলবার আর কোন অর্থ থাকতে পাবে, কোন উদ্দেশ্য থাকতে পাবে সুধাবউদির!

মিনিট কয়েক পবে বয় এসে পেঁয়াজ আর শশার কুচি ভরা প্লেট রেখে গেল সামনে। এল মাস্টার্ড আব সসের শিশি, এল কবরেজী কাটলেট।

সুধারাণী বলল, 'এতবড় কাটলেট কে খাবে। আমি চা ছাড়া কিছু খাব না। তুমি খাও শীতাংশু। আমি 'তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম।'

শীতাংশু বলল, 'তা জানি। এই খাওয়াটাও ঠাট্টারই অঙ্গ বলে মনে করুন।'

সুধারাণী বলল, 'সময়ে সব কিছুই বদলায়, তবে সকলের বেলায় তাড়াতাড়ি বদলায় না।'

শীতাংশু বলল, 'কি রকম ?'

সুধারাণী বলল, 'এই যেমন তোমার খাওয়ার ধরন বদলায় নি, বদলায় নি কথা বলার কায়দা। এমন কি চেহারাটা পর্যন্ত যেন ঠিক তেমনি আছে।'

শীতাংশু কাঁটায় ফুঁড়ে কাটলেটের টুক্‌রো মুখে পুরতে পুরতে হেসে বলল, 'এইবার আপনি বড়ই মন-রাখা কথা বললেন। মানুষের চব্বিশ বছরের চেহারা আর ছত্রিশ বছরের চেহারা এক-রকম থাকে না।'

সুধারাণী বলল, 'ছত্রিশ ? অত হল তোমার বয়স ? সত্যি দেখে কিন্তু মনে হয় না। বললে কি হবে, বাইরের দিক থেকে তুমি তেমন বদলাও নি কিন্তু ভিতরটা একেবারেই পালটে গেছে।'

শীতাংশু গম্ভীর দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই বদলায় সুধা-বউদি, তাই নিয়ম।'

সুধারাণী একটু হাসল, 'নিয়ম ? তখনকার দিনে তুমি কিন্তু অত নিয়মের দোহাই দিতে না। বরং নিয়মকে উড়িয়ে দিতেই ভালোবাসতে, অনিয়মের দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল। মনে আছে সে কথা ?'

সুধারাণীর কথার জবাব না দিয়ে শীতাংশু কাটলেটের দিকে মন দিল। ওসব কথায় কান দিয়ে লাভ নেই। কথায় শুধু কথা

বাড়বে। তা ছাড়া ওসব কথা শুধু শব্দ। ধ্বনিহীন, ব্যঞ্জনাহীন, নিছক শব্দ। কোন অর্থ নেই।

তখনকার কথা! কখন থেকে সেই 'তখন' আরম্ভ। এম.-এ. পাশ করে যখন ট্যুইশন করছে আর চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে শীতাংশু? না কি তারও চার বছর আগে যখন মফঃস্বল শহর থেকে কলকাতায় বি.-এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, উঠেছে মীর্জাপুরের এক সস্তা মেসে, তারপর বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছে তালতলায় মেজো মাসীমার সঙ্গে। ভাড়াটে বাড়ি হলেও অনেকগুলি ঘরওয়ালা বেশ বড় একটি দোতলা বাড়ি। আর বাড়ি-ভর্তি লোক। মেসোমশাইরা তিন ভাই। তাঁদের অনেক ছেলেমেয়ে, ভাগ্নে-ভাগ্নী। মাসিমা তাদের কারো কারো সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে শীতাংশুর বাবাকে অনুযোগের সুরে বললেন, 'জামাইবাবু, কলকাতায় আমার বাসা থাকতে আপনি শীতুকে হোটেল মেসে রেখে পড়াবেন? আমরা কি এতই পর হয়ে গেছি?'

শীতাংশুর বাবা বললেন, 'তা নয় বীণা, তোমার এখানে তো নানারকম অসুবিধে। তা ছাড়া জয়েণ্ট ফ্যামিলির ব্যাপার, কে কি মনে করবে, তোমাকে শেষে লজ্জায় পড়তে হবে।'

বীণা মাসিমা বললেন, 'শুধু সেজন্যেও নয়। আমি জোর করেই শীতুকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসতাম, অত লজ্জা সংকোচের ধার আমি ধারি নে। কিন্তু আবার ভাবলাম এ বাড়ির যে আব্‌হাওয়া আর পড়াশুনোয় ছেলেদের যা মনোযোগ তাতে এখানে ওর না আসাই ভালো।'

শীতাংশুর বাবা বললেন, 'তুমি কথাটা আগে বলে ফেললে, আমিও তাই বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি এখানে অসাধ্য সাধন করেছ বীণা। তোমার ছেলে দুটি তো এই এ্যাটমস্‌ফিয়ার-এর মধ্যে থেকেও মানুষ হয়ে উঠেছে।'

শীতাংশুর দুই মাসতুতো ভাইয়ের একজন তখন বি.এস.-সি. পড়ে, আর একজন শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে। শীতাংশু বড় বোনের ছেলে হলেও বয়সে বড় নয়। তার আগে তিনটি বোন আছে।

কিন্তু সেই জনবহুল বাড়িতে আপন মাসতুতো ভাই-বোনেদের থেকে শীতাংশুর বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সুধাবউদির সঙ্গে। তিনি মাসীমার ভাসুরপো নিশীথ রায়ের স্ত্রী। এ বাড়িতে প্রথম ম্যাট্রিক-পাশ করা বউ। দেখতে সুন্দরী। নিজের বাপের অবস্থাও ভালো। তবু মনে সুখ ছিল না সুধাবউদির। স্বামীটি মানুষ নয়। কলিঙ্গায় ওঁদের যে একখানি ফার্নিচারের দোকান আছে, নিশীথদা সেখানে গিয়ে বসেন বটে কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকেন না। সন্ধ্যার পরই ক্যাশ থেকে যা পান—কাঁচা টাকাই হোক আর নোটই হোক, দু তিন মুঠো পকেট ভরে বেরিয়ে পড়েন। অনেক রাত্রে যখন বাড়িতে ফেরেন তখন পাঁড় মাতাল। কখনো হাউ হাউ করে কাঁদেন, কখনো বমি করে ভাসিয়ে দেন, কখনো সুধাবউদিকে ধরে মারপিট করেন।

একবার অসুস্থ হয়ে শীতাংশু মাসিমার বাড়িতে গিয়ে সপ্তাহ-দুই ছিল। তখন সে নিত্য দেখত এইসব কাণ্ড। কিন্তু দিনের বেলায় সুধাবউদিকে দেখে তাঁর মনের অশান্তির কথা টের পাওয়া

যেত না। তিনি কাজকর্মের ফাঁকে প্রায়ই এসে শীতাংশুর বিছানার পাশে বসতেন। ওষুধপত্তর খাওয়াতেন, নানারকম গল্প করতেন। হাসিমুখের আড়ালে জীবনের সব দুঃখকে তাঁর প্রাণপণে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা দেখে শীতাংশু অবাক হয়ে যেত। তত যেন বেশি ভালো লাগত - সুধাবউদিকে।

মাসিমা মাঝে মাঝে বলতেন, 'সুধা, তুমি যে এদিকে এত ঘন ঘন আস, আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগে না বাপু। নিশীথের তো মাথারও ঠিক নেই, মুখেরও ঠিক নেই। যদি কিছু একটা বলে টলে বসে। কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকবে না।'

সুধাবউদি হাসতেন, 'বলুক না কাকিমা। তাতে কি এসে যায়।'

এসব কথা শীতাংশুর সামনেই হত। সে অবশ্য শুনব না শুনব না করে মুখ ফিরিয়ে থাকত। দেখব না দেখব না করে পাশ ফিরে শুত। তবু সুধাবউদির সেই রহস্যময় হাসি শীতাংশুর চোখের সামনে ভাসত। তিনি চোখের সুমুখ থেকে সরে গেলেও সেই হাসিমুখ মুছে যেত না। বরং স্বপ্নে তা বার বার ভেসে উঠত, উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

শীতাংশু মনে মনে ভাবল, বলুক না। কেউ কেউ সাহস করে, স্পষ্ট করে বলুক। কিছু এসে-গেলেই বা ক্ষতি কি। কিন্তু তখন কেউ কিছু বলত না। এমন কি মাতাল নিশীথ রায় পর্যন্ত শীতাংশুকে স্নেহ করত, সন্দেহ করে তাকে একটুও গৌরবের অধিকার দিত না।

শীতাংশুর আশা পূর্ণ হল আরো তিন বছর পরে। তখন সে এম.-এ. পাশ করে পার্চেজ মিউনিশন অফিসে ঢুকেছে। যুদ্ধের অস্থায়ী চাকরি। মীর্জাপুরের মেসে থাকে। আর মাসিমাদের

পরিবারেও বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাঁর বড় ভাসুর মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে যৌথ পরিবার। কলকাতার নানা জায়গায়, কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে সেই টুকরোগুলি। কলিঙ্গার এজমালি দুখানা বড় দোকান বিক্রি করে যার যার অংশ নিয়েছে। নিশীথ রায় বহু টাকা আগেই ভেঙে ফেলেছিল। সে টাকার হিসাব সে দিতে পারে নি। নগদ দু এক হাজার নিয়ে তাকে সরে আসতে হয়েছে। তার খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইরা বলেছে ও টাকাও নিশীথের প্রাপ্য নয়। তারা দয়া করে ছেড়ে দিচ্ছে। আসলে ওকে জেলে দেওয়া উচিত।

নেবুতলায় স্বামীকে নিয়ে আলাদা বাসা করেছেন সুধাবউদি। পুরোন বাড়ির একতলায় ছোট ছোট দু খানা ঘর। চাকর বাকর কিছু নেই। একটি ঠিকে ঝি শুধু সম্বল। নিশীথদা সামান্য মাইনের এক মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। সে টাকায় সংসার চলে না। কারণ তার প্রায় সবই মদের দোকানে যায়। এমন কি বাপের কাছ থেকে যে সামান্য কিছু মাসোহারা পান সুধা বউদি, তাতে পর্যন্ত হাত পড়ে—হাত পড়ে তাঁর গায়ের গয়নায় কি অন্য কোন গোপন সঞ্চয়ে।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই নেবুতলার বাড়িতেও সুধাবউদির মুখে সেই অপরূপ হাসি। সে হাসি মোনালিসার হাসির চেয়ে কম রহস্যময় নয়। বরং বেশি বলেই শীতাংশুর তখন মনে হত। শীতাংশু নিজের মাসিমার বাড়িতে যেত না কিন্তু সুধাবউদির বাসায় আসত। তাঁর আদর আপ্যায়ন রসিকতা, নানা ধরনের ব্যঞ্জনাময় কথা শীতাংশুকে আকৃষ্ট করত।

সুধাবউদি মাঝে মাঝে বলতেন, 'আর সহ্য হয় না। আচ্ছা মানুষ কি কোনদিনই বদলায় না শীতাংশু ? কিছুতেই কি তার শিক্ষা হয় না ?'

শীতাংশু বলত, 'শিক্ষা দিতে পারলে হয়। আপনার আরো কঠোর হওয়া উচিত।'

সুধাবউদি হাসতেন, 'কোমলা নারীকে কঠোর হতে বলছ ? কি ভাবে কঠোর হবো বল তো ?'

শীতাংশু বলত, 'মাঝে মাঝে নিশীথদাকে আপনার ছেড়ে থাকা উচিত।'

সুধাবউদি মুখ টিপে হাসতেন, 'ওরে বাপ রে। যদি আর কারো কাছ থেকে আশ্বাস পাই, ওকে আমি মাঝে মাঝে কেন চিরদিনের জন্যে ছেড়ে দিতে পারি।'

শীতাংশুর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করত। আশ্বাস আর আশ্রয় দুই-ই সে তখন দিতে রাজী ছিল। কিন্তু সুধাবউদি কি তা নিতেন ? তা নেওয়ার মত সাহস কি তাঁর ছিল ? ছিল না। তাই শীতাংশুকে ডেকে তিনি শুধু ঠাট্টা করতেন, পরিহাস করতেন। জীবনের যা এক পরম গভীর আর মূল্যবান বস্তু তাকে নিয়ে কেবলই কৌতুক করতেন সুধাবউদি।

কিন্তু মাতাল নিশীথদা সব কৌতুক একদিন চুরমার করে দিলেন। সুধাবউদিকে মারলেন লাথি। আর শীতাংশুকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'শালা বদমাস, পাঁঠা, তুমি আমার বউকে ফুসলে নিয়ে যেতে এসেছ ?'

অনেকদিন পরে অপ্রমত্ত অবস্থায় শীতাংশুর কাছে ক্ষমা

চেয়েছিলেন নিশীথদা। কিন্তু সেই আগের সম্পর্ক আর জোড়া লাগে নি। শীতাংশু জোর করে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনেছে। লাথি খেয়ে স্বামীকে ত্যাগ করেন নি সুধাবউদি। চেষ্টা চরিত্র করে এক মেয়ে-স্কুলে সেলাইয়ের মাস্টারি নিয়েছেন। বহু ধৈর্য সহিষ্ণুতা আর অধ্যবসায় নিয়ে স্বামীকে মদ ছাড়িয়েছেন। একটু বেশি বয়সে সুন্দর ফুট্‌ফুটে একটি ছেলেও হয়েছে ওঁদের। যে লাথি তিনি খেয়েছিলেন তা তাঁর দুর্ভাগ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আবার তিনি নতুন করে শীতাংশুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান। তাঁর আশা দুঃখের দিনে শীতাংশুকে যেমন বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন, সুখের দিনেও তাই পাবেন। কিন্তু শীতাংশুর অত সময় কই ?

সত্যি সময় নেই। হাতঘড়ি দেখে এবার উঠতে চাইল শীতাংশু। বলল, 'এবার চলি। টেবিলে অনেক কাজ এসে জমেছে।'

সুধারাণী একটু হাসল, 'অফিসার মানুষ, কাজ তো জমবেই। কিন্তু আমিও তোমার কাছে একটা কাজের কথা নিয়েই এসেছি শীতাংশু।'

শীতাংশু উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'তাই নাকি ? বলুন, বলুন। এতক্ষণ বলেন নি কেন ?'

সুধারাণী বলল, 'আমাকে হাজার পাঁচেক টাকার ব্যবস্থা করতে পার তোমাদের ব্যাঙ্ক থেকে ?'

শীতাংশু একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'অত টাকা দিয়ে কি করবেন ?'

সুধারাণী বলল, 'আমি কিছু করব না, করবেন তোমার

নিশীথদা। বুড়ো বয়সে পরের চাকরি আর তার পোষাচ্ছে না; ফের ব্যবসায়ে নামতে চান।'

'ফের ফার্নিচার?'

সুধারাণী বললেন, 'ফার্ণিচারও হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে। দাও না একটা ও. ডি.র ব্যবস্থা করে? আমার অবশ্য সামান্য কিছু গয়না এখনো আছে, যদি চাও তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।

শীতাংশু ঘাড় নেড়ে বলল, 'অসম্ভব। আজকাল ওসব সিস্টেম আর নেই বউদি। মাফ করবেন।'

সুধারাণী বললেন, 'কিন্তু তুমি কি চেষ্টা করলে পার না? অন্তত তোমার নিজের একাউন্ট থেকে—! পাঁচ হাজার টাকা তোমার কাছে কি।'

শীতাংশু বলল, 'না বউদি, তা হবার জো নেই।'

হঠাৎ সুধারাণী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল, 'হবার জো যে নেই তা আমি আগেই জানতাম। একদিন যার জন্যে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করা যায়, পরে তার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করা যায় কিনা তাই একটু যাচাই করে দেখছিলাম। টাকার আমার দরকার নেই শীতাংশু। আমাদের বাসায় গিয়ে দেখে এসো আমি সত্যি কি মিথ্যে বলছি। তুমি গেলেই আমি খুশী হব।'

সুধারাণী হাসিমুখে আর শীতাংশু গম্ভীর মুখে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল।

শীতাংশু মনে মনে ভাবল, যতই হাসুন সুধাবউদি, পরীক্ষায় যদি সে ফেল করে থাকে, সে একা করে নি।

শেলি

ভেটেরিন্যারী কলেজের মেডিসিনের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর মৃগাঙ্ক রায় ঘরের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গল্প করছিলেন। সে গল্পের কোন মাথা-মুণ্ডু ছিল না। কাহিনী তো নয়ই। বাজার-দর, রাজনীতি থেকে শুরু করে আধুনিক মেয়েদের চালচলন, সাজসজ্জা সবই তার আলোচ্য বিষয়।

বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। উঠি উঠি করে তিনিও উঠতে পারছিলেন না, আমারও ওঠা হচ্ছিল না।

তিনি এক ফাঁকে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'উসখুস করে কি করবেন মশাই। বৃষ্টিও থামবে না, আমিও উঠব না। আপনার লেখা যা মাটি হবার হয়েছে। সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এবার মনের সুখে কথা বলুন দেখি। আর আপনার গিন্নীকে বলুন ফের দু কাপ চা পাঠাতে।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দোরের দিকে দু পা হেঁটে পর্দা তুলে অন্দরমহলের উদ্দেশে বললাম, 'আর দু কাপ চা দিয়ো তো মৃগাঙ্কবাবুর জন্যে।' তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, 'আরে মশাই মৃগাঙ্কবাবুর জন্যে দু কাপ নয়। গেস্টের জন্যে এক কাপ, হোস্টের জন্যে এক কাপ। আমি হিসেব করেই বলেছি। কিন্তু আপনি বোধ হয় ভয়ানক রেগে গেছেন।'

আমি হেসে বললাম, 'কেন, রাগ করব কেন!'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই রেগেছেন। নইলে কি একসঙ্গে

দু কাপ চা গলগল করে আমার গলায় ঢালতে চাইতেন আপনি ? লেখার ব্যাঘাত হলে আপনারা মশাই খুন করতে পারেন। আপনাদের অসাধ্য কাজ নেই। জীবনে আরো দু এক জন লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আপনারা এক অদ্ভুত জীব।'

হেসে বললাম, 'জীব ? কোন শ্রেণীর জীব বলে মনে হয় আমাদের ?'

মৃগাঙ্কবাবুও হাসলেন, 'আপনাদের মধ্যেও নানা শ্রেণী আছে। আপনাদের ভাষাতেই বলি। কেউ পোষমানা কুকুর, বেড়াল কি হরিণের মত, কেউ বা—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কালো ছিপছিপে পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে পর্দা সরিয়ে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল, 'বউদি, বউদি দেখুন, আমাদের বেড়ালের বাচ্চাটা কি সুন্দর হয়েছে। ঠিক একেবারে হরিণের মত দেখতে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই মেয়েটি লজ্জিত হয়ে পড়ল। যার খোঁজে সে এসেছিল তাব সেই বউদি এ ঘরে নেই। একটু জিভ কেটে পালাতে যাচ্ছিল আমি ডেকে বললাম, 'শেলি, শোন, শোন। তোমার হরিণের মত বেড়াল ছানাটা আমাদের একটু দেখিয়ে নাও।'

শেলি একবার ইজিচেয়ারে শায়িত অপরিচিত মৃগাঙ্কবাবুর দিকে তাকাল—আর একবার আমার দিকে। তারপর কোলের সাদা আর পাটকেলে রঙে মেশানো বিড়াল শিশুটির দিকে সস্নেহে সকৌতুকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'পরে দেখবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল বাইরে।

আমরা দু জনেই গেরুয়া রঙের পর্দার মৃদু আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটু বাদে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'মেয়েটি কে?'

বললাম, 'আমাদের পাশের বাড়ির।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'ভারি চঞ্চল তো।'

বললাম, 'হ্যাঁ, এখনো নিজে চঞ্চল। এর পরে আর পাঁচ জনকে চঞ্চল করবে।'

মৃগাঙ্কবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'এই বুঝি আপনার কাব্য আরম্ভ হল? মেয়ে দেখলেই কাব্য করবার লোভ সামলাতে পারেন না। ভারি খারাপ অভ্যাস। নামটা কি বললেন, 'শেলি'?'

বললাম, 'হ্যাঁ, ওই ওর ডাক নাম। স্কুলে ভালো নামও যেন কি একটা আছে। জানি নে।'

মৃগাঙ্কবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। কিসের একটা ছায়া পড়ল তাঁর মুখে। বোধ হয় স্মৃতির।

পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে তাঁর বয়স, কিন্তু ওঁকে আমি এমন গম্ভীর কোনদিন আর দেখি নি। গাম্ভীর্য ওঁর চেহারার সঙ্গে মানায় না, স্বভাবের সঙ্গেও নয়। লম্বা দোহারা গড়ন। এই বয়সেও অতিরিক্ত মেদ সঞ্চয় করেন নি। কিংবা অভিজ্ঞতার ভারে নুয়ে পড়েন নি। সচ্ছল অবস্থার সুখী মানুষ। ভালো চাকরি করেন। ঘরে সুগৃহিণী এবং অনুগত পুত্রকন্যা। বয়সের ছাপ তেমন চেহারায় পড়ে নি, মনেও পড়েছে বলে মনে হয় না। এখনো হো হো করে হাসেন, ভোঁ ভোঁ করে ছোটেন, টো টো করে ঘোরেন

এখানে ওখানে। আর অনর্গল কথা বলেন। জ্ঞানের কথাও নয় বিজ্ঞানের কথাও নয়। যে সব কথার 'কোন মাথা-মুণ্ডু নেই। কিন্তু চমৎকার একটি লেজ আর চারখানা পা আছে। সেই চতুষ্পদ মুণ্ডহীন ঘোড়া কেবলই লাফিয়ে লাফিয়ে এ প্রসঙ্গ থেকে ও প্রসঙ্গে ও প্রসঙ্গ থেকে সে প্রসঙ্গে ছুটে বেড়ায়। ওঁর কথায় তাই মাথা-মুণ্ডু না থাকলেও রূপ আছে, গতি আছে। ভদ্রলোককে এই জন্যেই আমার খুব ভালো লাগে। এই বয়সেও বেশ সরল আর সজীব, যেখানে আমরা শুধু জীব। পাড়ায় ভদ্রলোকের ডাক নাম 'বাঘাদা'। কিন্তু ওঁর মধ্যে ব্যাঘ্র-স্বভাবের চেয়ে অশ্ব-স্বভাবই বেশি। নেহাতই ঘোড়াদা বলে ডাকা যায় না, তাই বোধ হয় ওই নামে ছেলেরা ডাকে। ওঁর ছেলের বয়সী ছেলেদেরও উনি দাদা।

মৃগাঙ্কবাবুর মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া দেখে আমি একটু বিস্মিত হলাম। অবশ্য বিস্ময়েব কিছু নেই। একই মানুষের মন নানা আলোছায়ার খেলায় বিচিত্র। মুখ তো তারই চিত্রিত প্রতিবিম্ব।

একটু বাদে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার মৃগাঙ্কবাবু? শেলি নামে আর কোন মেয়েকে চিনতেন নাকি আপনি!'

মৃগাঙ্কবাবু একটু যেন চমকে উঠলেন। তারপর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না না, মেয়ে নয়, মেয়ে নয়। শেলি ছিল একটা কুকুরেব নাম।'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কুকুর!'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, dog, Irish Terrier. এক নাম কত জনের থাকে। শেলি একজন বিখ্যাত কবির নাম। মানে পদবী। আমরা নাম হিসেবেই ব্যবহার করি। আবার চাঁটগায়ে

শেলি নামে আমি একটা কুকুরকে জানতাম। আবার প্রায় কুড়ি বছর পরে দেখছি শেলি একটি মেয়ের নাম।'

আমি বললাম, 'মেয়ের কথা থাক। আপনার কুকুরের গল্পই শুনি।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'গল্প! হ্যাঁ, সে একটা গল্পই বটে। আর কুকুরটাও একটি মেয়েরই কুকুর।'

আমাদের বাড়ির ছোকরা চাকর চিত্ত দু কাপ চা নিয়ে এল। মৃগাঙ্কবাবু একটি কাপ তার হাত থেকে নিয়ে ইজিচেয়ারের হাতলের উপর রাখলেন। এক বার চুমুক দিয়ে বললেন, 'বেশ চা আপনার।'

একটু যেন চাঙ্গা বোধ করলেন তিনি। দ্বিতীয় চুমুকের পর ফের শুরু করলেন গল্প।

'আজকের কথা নয়, উনিশ বছর আগের ঘটনা। থার্টি-সেভেন থার্টি-এইট। আমি তখন চাঁটগা টাউনে। কলেজ হাসপাতালের এ্যাসিস্ট্যান্ট স্নুপারিনটেনডেন্ট। লোকজন কম। তাই সব ওয়ার্ডেই ঘোরাফেরা করতে হয়। ডগ ওয়ার্ডটা আমার ডাইরেক্ট স্নুপারভিসনে ছিল। মিসেস্‌ চ্যাটার্জীর সঙ্গে সেই ডগ ওয়ার্ডেই আলাপ। তেইশ চব্বিশ বছরের একটি সুন্দরী বাঙালী মেয়ে, ছিপ-ছিপে চেহারা। ফুটফুটে কিন্তু বেশ মাজা রঙ। রূপ বর্ণনা করতে পারব না মশাই। মুখে বলতে গেলে যা মামুলি শোনায়, চোখে দেখলে তাকেই মনে হয়, এমন আর দেখি নি। বিশ বছর আগেকার কথা। তখন তো এমন বুড়ো হই নি। তখন চোখ ছিল। আপনাদের মত কবি আর লেখকের চোখ অবশ্য নয়।

আপনাদের চোখ সব বয়সেই থাকে। অমন সুন্দরী মেয়ে। তার কোলে ছোট কালো একটী কুকুর। আমি দেখেই চিনলাম। আইরিশ টেরিয়ার। কুকুরের মালিককেও দেখেই চিনতে পারলাম। শিক্ষিত অভিজাত ঘরের মেয়ে। আপনাদের ভাষায় যাকে বলে অগ্নিশিখা। মাথায় আঁচল নেই, কপালে সিঁদুরের রেখা আছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে আপনার কুকুরের ?'

মহিলাটি বললেন, 'পাহাড়ী-পথে চলতে গিয়ে পা পিছলে পড়েছে। দারুন চোট লেগেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। দেখুন দেখি ফ্র্যাক্‌চার হয়ে গেছে কিনা! তাহলে তো বড় মুসকিল হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা ম্লান হল, চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল।

আমি হেসে বললাম, 'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? খুব সম্ভব কিছুই হয় নি। যদি হয়েই থাকে, তাতেই বা কি! আমরা তো এই জন্যেই আছি।'

মহিলাটি এবার খুশী হলেন। তাঁর পিছনে একজন ভদ্রলোকও দাঁড়িয়ে ছিলেন। শান্তশিষ্ট মুখচোরা। বয়স তিরিশের কাছাকাছি।

তিনি এবার এগিয়ে এসে বললেন, 'তাহলে কি ওকে এ্যাডমিট্ করে নেবেন ?'

আমি কোন কথা বলবার আগেই মহিলাটি বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই। আমার স্বামী, মিঃ চ্যাটার্জী। পোর্ট-কমিশনারে আছেন।'

'আপনিই তো ডক্টর রায়, আপনার নাম আমি শুনেছি।'

মহিলাটি মৃদু হাসলেন।

বোধ হয় ডগ ওয়ার্ডের ডাক্তার বলেই আমার খোঁজ খবর নিয়ে থাকবেন।

প্রথম আলাপ এই ভাবেই হল।

টেরিয়ারটারকে আমি ভর্তি করে নিলাম। না দেখে শুনে ছেড়ে দেওয়া যায় না। বড়লোকের কুকুর।

কুকুরটা এক সপ্তাহ ছিল হাসপাতালে। মিসেস চ্যাটার্জী—পরে ওঁর নামও জেনেছিলাম সুনীতা চ্যাটার্জী, রোজ আসতেন। ক্যারিয়ারে করে খাবার আনতেন। পরম আত্মীয় কেউ হাসপাতালে থাকলেও লোকে অত যত্ন নেয় না, অত উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তারের কাছে খোঁজ-খবর করে না। মিসেস চ্যাটার্জী চেম্বারে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। আমি ওঁকে বোঝাতাম শেলির স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। ভয় ও ভাবনার কোন কারণ নেই।

ওঁর কুকুরের নাম যে শেলি তা আমি প্রথম দিনেই জানতে পেরেছিলাম।

যা হোক সপ্তাহখানেকের মধ্যেই শেলির পা ঠিক হয়ে গেল। ওকে আমরা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জী আমাকে ছাড়লেন না। তিনি বললেন, 'আমাদের ওখানে কবে আসছেন, বলুন?'

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে তিনি বললেন, 'আপনি বলতে পারবেন না, আমিই বলি। এই রবিবার আসুন। বিকেলে একসঙ্গে আমরা চা খাব। মিসেস রায়—'

আমি বললাম, 'তিনি তো এখানে নেই, তিনি কলকাতায়।'

মিসেস চ্যাটার্জী হেসে বললেন, 'সরি। তাহলে পথটুকু আপনাকে একাই আসতে হবে। ওখানে আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

নিমন্ত্রণ রাখলাম। আমাদের হাসপাতাল আব কোয়ার্টার শহরের মাঝখানে। কিন্তু চ্যাটার্জীদের বাংলো শহরের প্রান্তে। কর্ণফুলীর একবারে ধারে। চমৎকাব ছোট্ট একটি বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে লন, ডাইনে বাঁয়ে ফুলের বাগান। দেশী বিদেশী নানা নামেব, নানা রঙের ফুলের সমারোহ। চোখ জুড়িয়ে গেল, মন জুড়িয়ে গেল, হোস্ট আর হোস্টেস দু জনেই এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন।

বাংলোর বারান্দা থেকে কর্ণফুলী নদীর মোহানা দেখা যায়। বেশ ছড়ানো। যেন পার নেই কূল নেই। সমুদ্রে পড়বার আগেই নদী যেন আগেই সমুদ্র হয়ে গেছে। আর নদীব অন্য পাড়ে পাহাড়। গেরুয়া রঙের ধূ ধূ পাহাড়ের সারি। সব ফেলে, সব কাজ-কর্ম ভুলে চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। এখানে এলে অ-কবিও কবি হয়। মিঃ চ্যাটার্জী—পবে শুনেছিলাম নাম সুবিমলবাবু—তিনি যে কবিতা লিখবেন তাতে আর বিচিত্র কি! এখানে থাকলে অসুখীও সুখী হয়। এই দুটি সচ্ছল সুশিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ যে সুখে আছেন তাতে আর বিচিত্র কি!

কিন্তু পরে জেনেছিলাম স্বামী-স্ত্রীর সুখের পথে কোথায় যেন একটা কাঁটা আছে।

ওঁরা সেদিন আমাকে খুবই আপ্যায়ন করলেন, কিন্তু এক দিন

গিয়েই রেহাই পেলাম না। মিসেস চ্যাটার্জী আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করতে থাকলেন। কোনদিন চায়ে, কোনদিন লাঞ্চে, কোনদিন ডিনারে। মিসেস চ্যাটার্জী আমাকে বলতেন, 'এখানে আমাদের বেশী বন্ধুবান্ধব নেই। আপনাকে বন্ধু হিসেবে পেলে আমরা খুশী হব।'

আমি যেদিন যেতাম সেদিন ওঁদের বাড়িতে ভিড় থাকত না। বাইরের দু এক জন বন্ধুকে কোন বার বলতেন, কোন বার বলতেনও না। আমি একাই বসে বসে মিসেস চ্যাটার্জীর সঙ্গে গল্প করতাম। কবি সুবিমলবাবু আমাদের সঙ্গে মিনিট কয়েক থেকেই তাঁর ঘরে চলে যেতেন। গিয়ে বসতেন তাঁর জানালার ধারের টেবিলে। লিখতেন, পড়তেন, কখনো বা শুধু চুপ করে বসে থাকতেন। চেয়ে থাকতেন দূরের সমুদ্র আর পাহাড়ের দিকে।

মিসেস চ্যাটার্জী বলতেন, 'কিছু মনে করবেন না। মিঃ চ্যাটার্জী একটু আনসোস্যাল। অফিসেও কারো সঙ্গে মেশেন না। নিজের বাড়িতেও পরের মত থাকেন। আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। কিন্তু কারো স্বভাব অন্য কেউ বলে ফেরাতে পারে না।'

মিসেস চ্যাটার্জী হাসতে হাসতেই বলতেন কথাগুলি। কিন্তু তাঁর সেই হাসি সত্ত্বেও মনের অভিযোগ, দুঃখ, ব্যথা গোপন থাকত না।

মিঃ চ্যাটার্জী না এলেও শেলি এসে বসত। মিসেস চ্যাটার্জীর পায়ের কাছে চুপ করে বসে থাকত। কখনো মুখ তুলে আমাদের কথা শুনত, কখনো বাইরের দিকে তাকিয়ে সমুদ্র আর পাহাড়

দেখত। প্রথম প্রথম আমাকে দেখলে শেলি ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাত। কিন্তু দু দিন দেখবার পরেই আমাকে ও চিনে ফেলল। আমি চ্যাটার্জীদের শত্রু নই, বন্ধু, চোর নই, সাধু সে কথা বুঝতে ওর দেরি হল না। এখন আমি একটু ডাকলে শেলি কাছে আসে, আদর করলে তা মাথা পেতে নেয়, খুশী হয়ে লেজ নাড়ে। আর তা দেখে সব চেয়ে বেশি খুশী হন মিসেস চ্যাটার্জী। সুন্দরী মেয়ে হাসলে খুশী হলে কি রকম দেখায় তা আপনি দেখে থাকবেন। পৃথিবীর এক বিস্ময় পাহাড়, দ্বিতীয় বিস্ময় সমুদ্র আর তৃতীয় বিস্ময় সুন্দরী নারী। আমি এই তিন বিস্ময়ের মধ্যে আপনাদের মত চুপ করে বসে থাকতাম না, অনর্গল কথা বলতাম। পশুপক্ষীর কথা, দেশবিদেশের কথা, খাওয়া-দাওয়ার কথা ; নানা রকম মানুষ আর তার নানা রকম স্বভাবের কথা। আমার সেই কথা পাহাড় মুগ্ধ হয়ে শুনত, সমুদ্র মুগ্ধ হয়ে শুনত, মিসেস চ্যাটার্জী মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। কখনো বা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তেন। একমাত্র সমুদ্রের ঢেউকে তেমন করে লুটোতে দেখেছি।

কুকুরটিকে মিসেস চ্যাটার্জী খুব ভালবাসতেন আগেই বলেছি। তাকে ডগ-সোপ মাখিয়ে নাওয়াতেন, নিজের হাতে মাংস এনে খাওয়াতেন, আদর করতেন, ইংরেজী আর বাংলা দুটো ভাষা শেখাতেন। এতেই প্রায় তাঁর সমস্ত দিন কেটে যেত। আর সুবিমলবাবুর কাটত কবিতা নিয়ে। যেদিন অফিস থাকত না সেদিন দিনেও লিখতেন, যেদিন অফিস থাকত রাত একটার আগে চেয়ার ছেড়ে উঠতেন না।

মিসেস চ্যাটার্জী শুনেছি জজের মেয়ে। এদেশে থেকেও

বিদেশের আদব-কায়দা শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ। মিশনারী স্কুল কলেজে পড়াশুনা করেছেন। মিঃ চ্যাটার্জী স্যুট পরে অফিসে গেলেও বাড়িতে ধুতি পাঞ্জাবি পরেই থাকতেন। ইংরেজী সাহিত্য পড়লেও লিখতেন বাংলায়। সব ব্যাপারেই স্বদেশী ঘেঁষা। আমি একদিন হেসে বলেছিলাম, 'সুবিমলবাবু আপনি কুকুর অত অপছন্দ করেন কেন? কুকুরও তো আমাদের দেশের জীব। অমন যে যুধিষ্ঠির তিনি পর্যন্ত কুকুর নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন।'

তিনি জবাব দিলেন, 'অপছন্দ তো করি নে। তবে কোন কিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি ভালবাসি নে।'

মিসেস চ্যাটার্জী টিপ্পনী কাটলেন, 'এক কবিতা ছাড়া।'

শুনেছি কুকুরটার সঙ্গে মিসেস চ্যাটার্জীর এক মাসতুতো ভায়ের স্মৃতি জড়ানো। নামটাও তাঁরই রাখা।

যে কারণেই হোক সুবিমলবাবু শেলিকে কাছে ডাকতেন না, আদর করা তো ভালো, ছুঁয়েও দেখতেন না। স্ত্রীকে তিনি ঘৃণা করতেন না, তবে মনে মনে উপহাস করতেন, অনুকম্পা করতেন। জীবনের অত মূল্যবান সময় একটা কুকুরের পিছনে যে নষ্ট করতে পারে—সে অসামান্য সুন্দরী হলেও বোকা, বোধ হয় এই ছিল তাঁর ধারণা। তাকে দয়া করা যায়, ভালোবাসা যায় না, খুব সম্ভব এই ছিল তাঁর অভিযোগ। মিসেস চ্যাটার্জীর কুকুরপ্রীতিকে আমি প্রশ্রয় দিই, এই সন্দেহে সুবিমলবাবু আমাকেও অপছন্দ করতেন। এমন কি মাঝে মাঝে কথা পর্যন্ত বলতেন না। তবু আমি তাঁকে এক এক দিন জোর করে ধরে নিয়ে বেড়াতে বেরোতাম। ডিঙি নৌকোয় করে কর্ণফুলী পাড়ি দিতাম। অচেনা পাহাড়ী পথে

হাঁটতাম। আমরা চার জনে। দু জন পুরুষ, একটি মেয়ে আর একটি কুকুর। মিসেস চ্যাটার্জী নৌকো থেকে ঝুঁকে পড়ে হাতে করে নদীর জল তুলতেন। আমার মনে হত তিনি নিজেই কর্ণফুলী। পৃথিবীর কানের ফুল। আবার কোন দিন পাহাড়ী পথে উঠতে উঠতে হঠাৎ থেমে নাম-না-জানা নির্গন্ধ জংলা ফুল তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজতেন; কোন কোন দিন আমাদের পকেটে কি বোতামের ঘাটে গুঁজে দিতেও ছাড়তেন না। কোথায় যেন পড়েছিলাম, পুরুষ হল পাহাড়, মেয়েরা ঝরণা। পাহাড়ের বুক চিরেই তারা বেরিয়েছে। তবু ফাটা বুকের ব্যথা নিয়েও পাহাড় তাদের ভালোবাসে। মিসেস চ্যাটার্জীর সঙ্গে বেড়াবার সময় কথাটা আমার প্রায়ই মনে পড়ত।

এবার শেষের কথায় আসি। শেষের কথা বড় দুঃখের কথা। কলেজে পড়েছিলাম 'our sweetest songs are those that tell of saddest thought' তা দুঃখের গান মধুর হতে পারে, দুঃখ কোনদিন মধুর নয়। আপনারা কবিরা, যাই বলুন।

প্রথম আলাপ থেকে বছর খানেকের পরের ঘটনা। থার্টি-এইটের সেপ্টেম্বর। অফিসে কাজকর্মের চাপ বেশি। শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। বাবা আর তাঁর পুত্রবধূ ছুটি নিয়ে কলকাতা যাওয়ার জন্যে বার বার তাগিদ দিচ্ছিলেন। না যাওয়ার কারণ কি, তা জানতে চাইছিলেন। আমি শুয়ে শুয়ে জবাবের কথা ভাবছিলাম।

হঠাৎ দরজায় ঘা পড়ল। একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। তা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল।

'মৃগাঙ্কবাবু, মৃগাঙ্কবাবু!'

বিরক্ত হয়ে ভাবলাম এই দুপুর রাত্রে কে আবার এল। পশুর ডাক্তারের তো রাত্রে কল থাকে না!

শুয়ে শুয়েই হাঁক দিলাম, 'কে আপনি?'

'আমি সুবিমল। দরজা খুলুন।'

আমি এবার ব্যস্ত হয়ে আলো জ্বাললাম। দোর খুলে তাঁকে ডাকলাম ভিতরে।

বললাম, 'কি ব্যাপার সুবিমলবাবু? আপনি এলেন কেন এত কষ্ট করে। মালী কি চাকরকে পাঠালেই পারতেন।'

তিনি বললেন, 'যা অবস্থা তাতে আমাকেই আসতে হল।'

শেলি শিকলে আর কিছুতেই বাঁধা থাকতে চাইছে না। সারা দিন রাত কেবল ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাচ্ছে। চোখ দুটো লাল। থেকে থেকে বাঘের মত থাবা তুলছে। আর তা দেখে মিসেস চ্যাটার্জী কাঁদছেন, নিজে অস্থির হয়েছেন, সারা বাড়িটাকে অস্থির করে তুলেছেন।

আমি সুবিমলবাবুর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি যে স্ত্রীকে কত ভালোবাসেন এর আগে সত্যিই বুঝতে পারি নি। একটু আগে বলেছিলাম দুঃখ মধুর নয়। না কল্যাণবাবু, দুঃখও মধুর। কিন্তু বড় কড়া মিষ্টি।

অসুস্থ শরীর নিয়েও আমি গেলাম তাঁর সঙ্গে। রুমমেট আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট। তাঁকেও সঙ্গে নিলাম। গিয়ে দেখলাম চেন বাঁধা কুকুর অবিরাম ডেকে চলেছে। আর মিসেস চ্যাটার্জী অবিশ্রাম কেঁদে চলেছেন। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'মৃগাঙ্কবাবু,

সবাই বলছে শেলি নাকি পাগল হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই তা বিশ্বাস করি নে। আমার শেলি পাগল হতে পারে না। ও কত ঠাণ্ডা, কত শান্ত, আপনি বলুন ওর কী হয়েছে।'

আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম—পরিষ্কার Rabies case, শেলিকে আর রাখা যাবে না। কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জীকে সেই মুহূর্তে কথাটা বলতে আমার বাধল। বললাম, 'আপনি অত ভাবছেন কেন, দেখা যাক কি হয়।'

কিন্তু আমার উৎসাহটা তেমন জোরালো শোনালো না।

আমার ইচ্ছা ছিল সেই রাত্রেই শেষ করে দিই। কিন্তু কি একটা দুর্বলতায় পেয়ে বসল। মিসেস চ্যাটার্জীর মুখের দিকে তাকিয়ে পারলাম না। বললাম, 'খুব সাবধানে বেঁধে রাখুন। কাল দেখে-শুনে যা হয় করব।'

মিসেস চ্যাটার্জীর মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু আমি বিষণ্ণমুখে ঘরে ফিরলাম। পরদিন ভোরে ক্লোরোফরম্ ইন্‌জেকশন নিয়ে একেবারে তৈরী হয়ে গেলাম। জবরদস্ত এক কম্পাউডারকে সঙ্গে নিলাম।

কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জীর বাংলোয় গিয়ে শুনলাম সে আর এক কাণ্ড। সুবিমলবাবুর হাত কামড়ে দিয়েছে শেলি। কাল রাত্রে সে যখন কিছুতেই ঘুমোয় না আর কাউকে ঘুমোতেও দেয় না, আর মিসেস চ্যাটার্জীর কান্না থামে না, সুবিমলবাবু তখন খানিকটা ব্রোমাইড মিকশ্চার খাইয়ে দিতে গিয়েছিলেন শেলিকে। মিসেস চ্যাটার্জীই স্বামীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে ওষুধ শেলি খায় নি। বেশি সাধাসাধি করায় চটে গিয়ে

সুবিমলবাবুকে কামড়ে দিয়েছে। সে তো কুকুরের কামড় নয় বাঘের কামড়।

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'শিগগির Rabies Vaccine নিন মশাই, শিগগির নিন।' কিন্তু সুবিমলবাবু তখন কবিতার খাতা নিয়ে বসেছেন। আমার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। Please don't.'

আমি এবার শেলির শেষ চিকিৎসা করতে গেলাম। মিসেস চ্যাটার্জীকে সব বুঝিয়ে বললাম। তিনি বললেন, 'রাখবার আর কোন উপায় নেই?' আমি ঘাড় নাড়লাম। তারপর কম্পাউণ্ডার, মালী আর চাকরকে চটপট কাজে হাত লাগাতে বললাম। মিসেস চ্যাটার্জী ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। একবার শুধু আমাকে বললেন; 'ডাক্তার, যা করবার তোমার নিজের হাতে করো। আর যেন কেউ ওকে না ছোঁয়।' সেই প্রথম তিনি আমাকে 'তুমি' বললেন। আমার অনুমতি না নিয়ে, কারো অনুমতি না নিয়েই বললেন। কোন মেয়ের মুখে অত প্রিয় সম্বোধন আমি জীবনে আর শুনি নি।

কিন্তু আমার সাধ্য কি একা আমি শেলির সঙ্গে লড়ি। এদিকে মালী চাকর কি কম্পাউণ্ডার কেউ কাছে এগোয় না। আমি তখন ওদের জোর ধমক লাগালাম। আমার কথামত ওদের এক জন জোর করে শিকল টেনে কুকুরটাকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে রাখল আর দু জন কম্বল দিয়ে বন্ধ করে রাখল শেলির চোখ মুখ। আমি তখন সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। হার্টে লাগালাম ফোঁড়। একটা চীৎকার করে শেলি চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

'শেলি! শেলি !!'

আর একটা আর্তনাদে আমার দুই কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার জো হল। মিসেস চ্যাটার্জী ছেঁড়া লতাব মত লুটিয়ে পড়লেন।

তাঁকে শান্ত করে তুলতে দিন তিনেক লাগল। ইতিমধ্যে আমরা সবাই Rabies Vaccine-এর কোর্স নিতে লাগলাম। সুবিমলবাবুকেও দিতে গিয়েছিলাম। তিনি কিছুতেই নিলেন না। অদ্ভুত খামখেয়ালী আর মেজাজী মানুষ। এতদিন পরে তাঁকে চিনলাম। মিসেস চ্যাটার্জীকে সে কথা বলায় তিনি শিউরে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ। ওঁকে ধরে-বেঁধে যেভাবে পারেন রাজী করান।'

আমাদের দু জনেব চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সুবিমলবাবু vaccine নিতে রাজী হলেন। কিন্তু তাব আগেই infection আবম্ভ হয়ে গেছে। সাধারণতঃ এত তাড়াতাড়ি reaction হয় না। কিন্তু সুবিমলবাবুর বেলায় অন্যরকম হল। তিনি যেমন খেয়ালী, প্রকৃতিও তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত খেয়ালীপনা করল। প্রথম প্রথম গম্ভীর মুখে বসে থাকতেন সুবিমলবাবু। দিনরাত কি যেন ভাবতেন। ওঁর স্ত্রী ভাবলেন এই তো ওঁর স্বভাব। কিন্তু তারপর থেকে ওঁব অন্য মূর্তি দেখা গেল! হাতের কাছে যা পান তাই কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চান সুবিমলবাবু। আব থেকে থেকে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠেন। মৃত্যুর পর শেলি যেন নতুন জন্ম নিয়েছে। তারপর শেলির মতই ওঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হল।

মিসেস চ্যাটার্জী কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, 'ও শোধ নিয়েছে, আমার ওপর শোধ নিয়েছে।'

শহরের বড় বড় ডাক্তারকে ডেকে আনলাম। জেনারেল হসপিটালে সাধারণতঃ এসব কেস নেয় না। তবু ওঁর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দশ দিন বাদে সুবিমলবাবু মারা গেলেন।

মিসেস চ্যাটার্জী এবার আর কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন না। শুধু পাথর হয়ে রইলেন—শ্বেত পাথর। জ্যোৎস্না রাত্রে মার্বেল পাথরে গাঁথা গ্রে-ভইয়ার্ডের শান্তি দেখেছেন? তেমনি শান্ত হয়ে গেলেন মিসেস চ্যাটার্জী।

টেলিগ্রাম করে কলকাতা থেকে ওঁর ভাইকে আর কক্স্‌বাজার থেকে ওঁর মাকে আনানো হল। তাঁদের কাছে ওঁকে রেখে আমি ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। বদলির দরখাস্ত করে একটু তদ্‌বির করায় মঞ্জুর হল সঙ্গে সঙ্গে।

মৃগাঙ্কবাবু থামলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'অত নিষ্ঠুর হলেন আপনি? অত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?'

মৃগাঙ্কবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তাই এলাম। কোন শোকই চিরস্থায়ী নয়। চাঁটগায়ে আর বেশি দেরি করলে আমি হয় সুনীতার শেলি হতাম, না হয় সুবিমল। কিংবা এক সঙ্গে দুইই। তাই পালিয়ে এলাম। কারণ কলকাতায় আমার স্ত্রী-পুত্র আছে। আমি তাদের ভালোবাসি, তারা আমার ওপর নির্ভর করে। আমি না এলে তারা 'বে অব বেঙ্গলে' ভাসত।'

আরও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন মৃগাঙ্কবাবু। তারপর

বললেন, 'আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। কোথায় আছে জানি নে। কেউ কারো খোঁজ নিই নি। But still she haunts me, haunts me in my dreams.'

একটু হাসলেন তিনি।

বৃষ্টি অনেকক্ষণ আগেই থেমে গিয়েছিল। হঠাৎ তড়াক করে ঘোড়ার মত উঠে পড়লেন মৃগাঙ্কবাবু, 'চলি' বলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

সমাপ্ত

BIKRAM COLLEGE LIBRARY. Agartala.